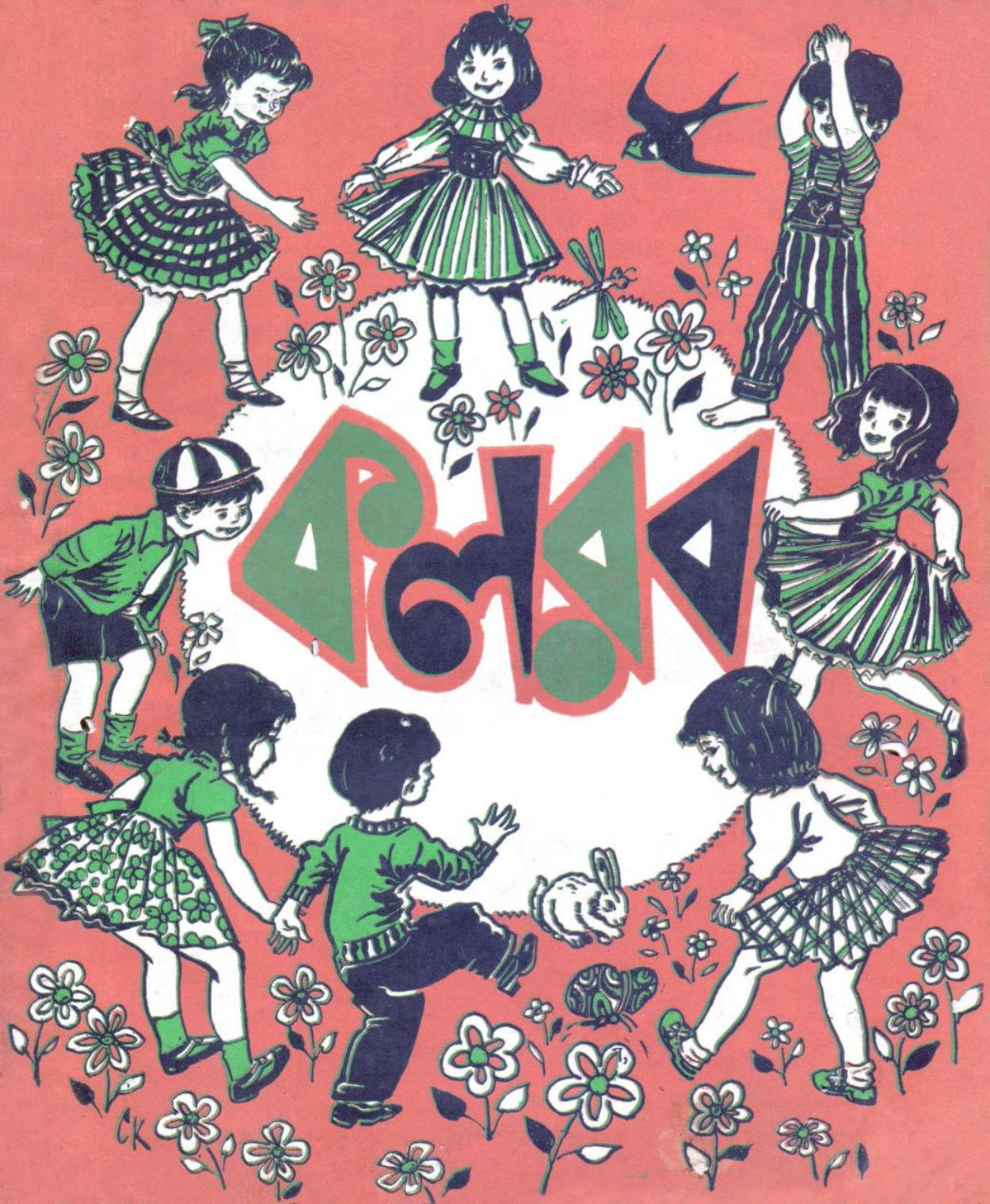
ABCDE

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of public Instructions, West Bengal as a children's monthly magazine. Vide No. 109 (16) T. B. C. Dated 15. 3. '73.

কলরব সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৭৩, আশ্বিন ১৩৮০

আগমনী (কবিতা)
কবিশেখর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৪৫

ছড়া (ছড়া)
বন্দে আলী মিয়া ৬৪৬

আগমনীর সুর (ছড়া)
ধীরেন করগুপ্ত ৬৪৬

বীর সেনাপতি (ঐতিহাসিক গল্প)
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৪৭

স্বাধীনতার একটি প্রদীপ
(জীবনী মূলক প্রবন্ধ)
হাসিরাশি দেবী ৬৫১

মেঘ ও রোদের খেলা (কবিতা)
নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৬৫৫

কে ? (চিত্র-কাহিনী)
শ্রীতুষার চ্যাটার্জী ৬৫৬

নাইলন আবিষ্কারের গল্প (প্রবন্ধ)
অমল শঙ্কর রায় ৬৫৮

অরণ্যে একরাত্রি (গল্প)
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৬৬১

আগে বলতে হয় (গল্প)
কুমারেশ ঘোষ ৬৬৫

বীর কিশোর (অনুবাদ গল্প)
শৈলেন দত্ত ৬৬৭

শর্করা থেকে সুগার (প্রবন্ধ)
শ্রীজ্যোতির্ময় হুই ৬৭১

অদ্ভুতদের কাণ্ড (ছড়া)
মোহন মিত্র ৬৭৪

আজব দেশে (ছড়া)
শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭৪

বুড়ো সৈনিক (গল্প)
নিখিল সেন ৬৭৫

মুড়ো (ছড়া)
সুনীল ভট্টাচার্য ৬৭৮

জানোয়ারদের বিচার (গল্প)
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ৬৭৯

আড়ি (কবিতা)
শুভেন্দু ঘোষ ৬৮২

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সন (প্রবন্ধ)
অমলকুমার মিত্র ৬৮৩

চরকা বুড়ী (গল্প)
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ৬৯০

টেনিদার অজলাভ (ধারাবাহিক উপন্যাস)
আশা দেবী ৬৯৩

মোটর চালাই (কবিতা)
ধীরেন বল ৬৯৭

টুকরো হাসি
ত্রিলোচন মুন্সী ৬৯৮

খেলাধূলা
মুকুল দত্ত ৬৯৯

ম্যাজিক
যাদুকর এ, সি, সরকার ৭০২

ধাঁধা ৭০৫

সম্পাদক/সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ● সহযোগী সম্পাদক/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ● চিত্রশিল্পী/চারু খান

দাম : ৯০ পয়সা

—নিয়মাবলী—

১. কলরবের প্রতি সংখ্যার মূল্য ·৯০ পয়সা। সডাক বার্ষিক চাঁদার হার ১০·৮০ টাকা ও ষান্মাসিক ৫·৪০ টাকা মাত্র। টাকা অগ্রিম না দিলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

২. পত্রিকা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ চিঠি-পত্র, ছবি, ফটো ও রচনা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৩. কলরব-এর বর্ষ অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু নির্ধারিত টাকা পাঠাইয়া অগ্রহায়ণ অথবা যে কোন মাস হইতেও গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবে, মনি অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৪. কলরব-এর গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা, তাদের তোলা ফটো এবং ছবি সম্পাদকের মনোনীত হইলে তাহা সাদরে প্রকাশ করা হইবে।

৫. বিশেষ সংখ্যার জন্য পৃথক দাম লাগিবে।

কর্মধ্যক্ষ
কলরব
বি-৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাঙ্কন, ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ একাদশ সংখ্যা ✱ অক্টোবর, ১৯৭৩ : আশ্বিন, ১৩৮০

আগমনী

কবিশেখর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ছাখো আবার চাহিয়া উছলি পড়িছে হাসি,
নীচে ঊর্মিরা নাচে খরধারে, উপরেতে মেঘরাশি।
শিউলির ফুলে ভরা প্রাঙ্গণ,
রবি-শশী ঢালে সোনার কিরণ ;
ধীরে বহে মৃদু সুখ-সমীরণ আনন্দ পরকাশি'—
চারিদিকে ছাখো আবার চাহিয়া উছলি পড়িছে হাসি।

এমনি মধুর সোহাগে যখন আপনি ভরিছে ভূমা,
আলো করি হের সবারি ঘরেতে আসিছে তখন উমা।
শরতের এই শুভ আগমনী
দিকে দিকে নানা গুঞ্জন-ধ্বনি
তুলিয়া সবারি অধরে দিতেছে সুধাময় কত চুমা ;
এমনি মধুর সোহাগ আ মরি ভরিছে এখন ভূমা।

———

ছড়া

বন্দে আলী মিয়া

সন্ধ্যা বেলায় ডাক্‌ছে ফেউ
বাঘ দেখেছো তোমরা কেউ ?
লেপের ভিতর কাজলা পুষি
খোকন তাইতে দারুণ খুশী—
ঘরের চালে টিক্‌টিকি ওই
পড়্‌ছে বসে খোকার বই।

পুষির মুখে বেজায় হাসি
ইঁদুর ধরে একশ' আশি—
ভাব্‌ছে মনে মারবে বাঘ
হাতীর পরে ভীষণ রাগ
সিংহ, জিরাফ মার্‌বে সুখে—
হেথায় রবে কোন্ বা দুখে !

আগমনীর সুর

ধীরেন করগুপ্ত

হিমেল হাওয়ার পরশ পেয়ে
শিউলি ওঠে হেসে।
সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ে
সবুজ পাতার দেশে॥
থৈ থৈ থৈ নীল আকাশে
সাদা মেঘের খেলা।
ফুলের বনে ভোমরা ওড়ে
সন্ধ্যে, সকাল বেলা॥
কাশের বনে, বইছে হাওয়া
ফুর ফুর ফুর ফুর,
বাউল বুড়োর এক তারাতে
আগমনীর সুর॥

মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের চিরকালের শত্রু ছিলো রাজপুত ও মারাঠাজাতি। তাদের দমন করতে সম্রাটের যে কতো কৌশল অবলম্বন করতে হতো তার অবধি নেই। তিনি ছিলেন গোঁড়া ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী। তাঁর রাজনীতিতে ছিল না কোনো উদার মনোভাব।

সে-সময়ে মাড়বারের রাণা ছিলেন যশোবন্ত সিংহ। তিনি যোধপুরের রাজাও ছিলেন। আবার সম্রাট ঔরংজেব তাঁকে বিশ্বস্ত সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। সীমান্ত রক্ষার ভার ছিল তাঁর ওপর। কূটনীতিজ্ঞ ঔরংজেবের ধারণা ছিলো—বিদ্রোহ করলে তাঁকে সহজে ধরা যাবে।

আকস্মিকভাবে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ঘটলো। ঔরংজেব দেখলেন…এই তো সুবর্ণ সুযোগ—মাড়বার এবং যোধপুর দখল করার। অবিলম্বে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঐ দুই রাজ্য মোটেই তখন প্রস্তুত ছিল না। রণকৌশলে শিক্ষিত মুঘল সৈন্যরা অতি সহজে মাড়বার এবং যোধপুর দখল করে নিলো। ঔরংজেব মাড়বার রাজ্যে নিজের কর্মচারীদের নিযুক্ত করলেন। নামমাত্র তাঁরই একান্ত অনুগত যশোবন্ত সিংহের এক আত্মীয়কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

এদিকে যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র অজিত সিংহ সীমান্ত থেকে দেশে ফিরবার পথে অবরুদ্ধ হলেন। সম্রাট ঔরংজেব কিন্তু বেশিদিন তাদের আটকে রাখলে না। তাঁদের স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন।

ঔরংজেব যখন শুনলেন রাজপুতরা কুমার অজিত সিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন···তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন: এ অন্যায় তিনি কোন মতেই বরদাস্ত করবেন না। এ বিষয়ে বাধা তাঁকে দিতেই হবে। ভেবে ভেবে সম্রাট একটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। মাড়বারের শাসন কর্তাকে লিখে পাঠালেন: শুনতে পেলাম আপনারা কুমার অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসাবার আয়োজন করছেন, এতে আমার আপত্তি নেই। তবে দু'টি সর্ত মেনে নিতে হবে। প্রথমে তাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। দ্বিতীয় হলো তাকে মোঘল হারেমের বেগমদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

যখন শাসনকর্তার কাছে এ খবর পৌছালো তখন তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এ-আবার কেমনতরো প্রস্তাব। রাজপুতেরা শুনতে পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেলো। এ রকম অবমানকর অনুরোধ কিছুতেই সহ্য করবে না তারা। প্রাণের বিনিময়ে, দেশের স্বাধীনতার জন্য সবাই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে। তবু নিজেরা এভাবে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়বেন না। যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রীর ছেলে রাজপুত কুল-গৌরব বীর যোদ্ধা দুর্গাদাসের কানে এ সংবাদ এসে পৌছালো। তাঁর ধমনীতে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ বয়ে গেল। তিনি ছুটে গেলেন রাণীমা যশোবন্ত সিংহের পত্নীর কাছে। তাঁকে ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে কৌশলে গোপন পথে রাজধানী যোধপুরে নিরাপদে নিয়ে এলেন।

দুর্গাদাস সবিনয়ে রাণীমাকে বললেন: আপনি হয়তো সম্রাট আলমগীরের কথা শুনেছেন। মা, আমরা কিছুতেই এই অপমানকর প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। আমরা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবো। সম্মিলিত শক্তিতে সংগ্রাম করবো। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি। যেন কুমার অজিত সিংহকে মাড়বারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারি।

রাণীমার দু'টি চোখ আগুনের হল্কার মতো জ্বলে উঠলো। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন: মাড়বারের বীর সৈনিক তুমি। মাতৃভূমিকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল কর। এই আমার একলিঙ্গ দেবের কাছে প্রার্থনা। ভক্তি বিনম্র চিত্তে রাণীমাকে প্রণাম ক'রে বললেন দুর্গাদাস—

মাথা পেতে আপনার আদেশ মেনে নিলাম। আশাকরি একলিঙ্গদেব আমাদের সহায় হবেন। রাজধানী যোধপুরে রণভেরী বেজে উঠলো। সকলের মুখে ধ্বনিত

হয়ে উঠলো: জয় একলিঙ্গদেবের জয় জয় রাণীমাঈর জয়, জয় কুমারের জয়। মাড়বারের উষর মরুভূমির বুক চিরে সেই প্রতিধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুললো।

দুর্গাদাসের নেতৃত্বে সাজ সাজ রব উঠলো। রাজপুতেরা বীর নির্ভীক সন্তানেরা এগিয়ে আসতে লাগলো। যুদ্ধের জন্য বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা তাদের প্রাণে সঞ্চারিত হলো। যথাসময়ে ঔরংজেবের কাছে দূত মারফত পত্র দেওয়া হলো। তাতে লেখা ছিল—আপনি আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিন। অজিত সিংহকে মাড়বারের রাজা বলে স্বীকৃতি জানান। তা হ'লে আর কোন গোলমাল হবে না, যুদ্ধ-বিগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ঔরঙ্গজেব দূতের মুখে জানালেন: তা হয় না। হয় আমার প্রস্তাব মেনে নাও। না হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

রাণা রাজসিংহ তখন মেবারের রাণা। তিনি খবর পেয়ে বীর সেনানায়ক দুর্গাদাসের সঙ্গে যোগদান করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—মাড়বার ঔরঙ্গজেবের অধিকারে এলে—মেবারের পতন অনিবার্য।

মুঘলের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীরা একদিন সাড়ম্বরে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুহুর্মুহু কামান গর্জে উঠলো।

সম্মিলিত শক্তির কাছে মুঘল সৈন্যরা পিছু হটতে লাগলো। তারা কিছুতেই দুর্গাদাস ও রাণা রাজসিংহের বীরত্বের কাছে যুঝে উঠতে পারলো না। বাদশা আলমগীর প্রমাদ গুণলেন। এখন কী করা যায়! তখন তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র বাহাদুরশাহকে ডেকে পাঠালেন। স্নেহের সুরে বললেন যাও পুত্র! তুমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পরিচালনার ভার গ্রহণ করো। রাজপুতদের পরাভূত ক'রে মুঘলের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করো।

পিতার আদেশে পুত্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাজপুতদের বিপুল সৈন্যবাহিনীকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারলেন না। যুদ্ধের খবরে ঔরংজেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। পুত্রকে রণাঙ্গন থেকে ফিরতে বাধ্য করলেন। আকবর পিতার আচরণে ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি বীর সেনাপতি দুর্গাদাসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আশ্রিতকে আশ্রয় দান রাজপুতেরা পরমধর্ম বলে মনে করেন। দুর্গাদাস রাজপুত জাতির ঐতিহ্য রক্ষা করলেন। তিনি সাদরে সম্রাট পুত্রকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে কূটনীতি বিশারদ আলমগীর পুত্রের শত্রুপক্ষে আশ্রয়ের খবরে স্তম্ভিত হলেন। তিনি রাজপুত সেনানায়ককে জানালেন: আপনারা আমার পুত্রকে আশ্রয় দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন। আপনারা হয়তো জানেন না কী উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুশিবিরে সে যোগদান করেছে। কোন বুদ্ধিমান লোক কী শত্রুকে আশ্রয় দেয়? আপনাদের বন্ধুভাবে এ-কথাটুকু আমি জানালাম।

সম্রাট ঔরংজেবের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে বীর দুর্গাদাস আশ্চর্য হলেন। তিনি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি সেখানে থাকতে পারলেন না, পারস্য দেশে চলে গেলেন।

বহুদিন ধরে রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের যুদ্ধ হলো। সে যুদ্ধে মুঘল সৈন্যরা পরাজিত হলো। আলমগীরের বুকে পরাজয়ের বেদনা শেলের মতো বিদ্ধ হতে লাগলো। দুর্গাদাস হিন্দুদের ওপর চেঙ্গি আদায় প্রথা রোহিত করলেন।

অসামান্য শৌর্যবীর্যশালী সেনাপতি রাণীমায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা যথাসময়ে পালন করলেন। আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদুরশাহ যশোবন্ত সিংহের পুত্র যুবরাজ অজিত সিংহকে যোধপুরের রাণার সম্মানও দান করেছিলেন।

(অপ্রকাশিত)

স্বাধীনতার একটি প্রদীপ

হাসিরাশি দেবী

বিদেশী শাসকের ঘৃণা, অবহেলা আর পদে পদে লাঞ্ছনার আঘাত, ওদের শাসন-যুগের প্রথম থেকেই যে বিদ্রোহের তুষানল ভারতবাসীর মনের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলেছিল,—বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই তার গোপন শিখা স্ফুলিঙ্গের আগুন ছড়াতে লাগল চারিদিকে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য দেশেও।

এ আগুনের আঁচ এসে লাগলো ধনী থেকে দরিদ্র, বিদ্বান থেকে মূর্খ, আর বৃদ্ধ থেকে তরুণের প্রাণেও।

অতি বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী তাই একদিন ঘোষণা ক'রলেন—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার।"

কিন্তু, এ অধিকার পাওয়ার পথ তো সোজা নয়! সহজ নয়!

ভারতের সন্তানরা দুই মত পোষণ করেন এই কথার সঙ্গে। তার একটি—অধিকার নিতে হবে মীমাংসার পথে না হোক, শান্তির পথে, অসহযোগের পথে।

আর এক দল বলেন:

—না। চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করার জিনিস 'স্বাধীনতা' নয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি আর সাহসের ওপর নির্ভর করে।

ভারতের সীমানা পার হ'য়েও পৃথিবীর সুসভ্য দেশ আর শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয়দের এই চিন্তার ধারা,—এই মতবাদ।

যার সমর্থক মেলে! সহানুভূতিও পাওয়া যায়—যারা নিজের নিজের দেশকে ভালবাসে, জাতকে শ্রদ্ধা করে, তাদের কাছ থেকেও।

লণ্ডনের অন্যতম বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী—শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা।·· ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের সন্তান শ্যামজী শিক্ষাগ্রহণ করেন বিদেশে,—ব্যারিষ্টারী পাশ করে সেখানেই আইন ব্যবসা সুরু করেন।

কিন্তু বিদ্রোহের এ আগুন 'জ্বলল' সেখানেও; তাই তিনি স্থাপন ক'রলেন সেখানে 'ইণ্ডিয়া হাউস।' ছাত্রদের নিয়ে স্থাপিত করলেন 'হোমরুল সমিতি'—এবং সেখান থেকে নিজেদের মতামত নিয়ে প্রতিমাসে প্রকাশ হ'তে লাগল একখানি পত্রিকা। যার নাম—"ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিষ্ট।"

এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ভারতের শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং জনমত গঠন করা।

পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেত ভারতের সব জায়গায়, সব ঘরে।

পাঞ্জাবের সন্তান লালা পিণ্ডীদাস যথা সময়ে এইসব পত্র-পত্রিকা পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন।

কিন্তু, না—।···'ইণ্ডিয়া-হাউস' 'হোমরুল-সমিতির'-র স্থাপয়িতা শুধু নয়—প্রতীচ্যের সকল সু-সভ্য সমাজে, বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের এই পরিচালককে এত সহজে অব্যাহতি দিতে চান না, ভারতের শাসকগোষ্ঠি।

আলোচনা তুললেন কর্তৃপক্ষের কাছে।···

এ অবস্থায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিপক্ষে এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন?

ঃ তাইতো!

চিন্তিত হলেন বৃটিশ পার্লামেণ্ট।···পার্লামেণ্ট-এর সদস্যের দল সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েন।—কারণ, যাঁর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবটি আনা হ'য়েছে, তিনি

নিজেই একজন আইন-বিশেষজ্ঞ। আইন দিয়ে তৈরী সকল কূটনৈতিক চালই তাঁর জানা, আরও তার সঙ্গে জেনে রেখেছেন এসব বাঁধন থেকে মুক্ত থাকার উপায়; সুতরাং 'হট' বলতেই তাঁকে এসব কাজ থেকে হটানো সোজা নয়! সময় চাই, এবং তাঁকে 'হাতে-কলমে' বিপ্লবী প্রতিপন্ন করার মতও চাই প্রমাণ।

খবরটার আগেই অবস্থাটা অনুমান করেছিলেন শ্যামজী; বুঝেছিলেন, লণ্ডনে সকল সময়ে থাকাটা আর তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়; এজন্য থাকবার আর একটা আস্থানা তিনি ঠিক করে এলেন ফ্রান্সের প্যারিস শহরে।

লণ্ডনের আইনজীবি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ফ্ল্যাট সেদিন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ।

কিন্তু কোথায় শ্যামজী!

পাশাপাশি ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানায়—শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে এখানে তো কেউ থাকে না!

—কোথায় থাকেন?

—কেমন ক'রে বলবো?

সত্যিই শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার খোঁজ পাওয়া যায় না! তাই ওরা যাবার সময় ধ'রে নিয়ে যায় ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট পত্রিকার আর দু'জন কর্মকর্তাকে।

কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ তাতে বন্ধ হয় না! এর পর প্যারিস থেকেই প্রকাশ হতে থাকে পত্রিকা।

তাতে লেখা থাকে—

ভারতে গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ইংরেজকে শিক্ষাদান করতে হলে রুশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা চাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক,...১৯১০ সাল।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে বিচিত্রতর মত আর পথ। বহির্ভারতেও যথা সময়ে পৌঁছায় তার নির্দেশ। একই সঙ্কল্পে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন ভারতের প্রবাসী সন্তানরাও—"বন্দেমাতরম।"

এবারের বিশেষ খবর: সরকারী সনদ কেড়ে নেওয়া হ'ল লণ্ডনের দুইজন আইনজীবির।

অপরাধ—তাঁরা ভারতের সন্তান। ভারতের মুক্তিযজ্ঞের হোতা।

নাম—শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। বিনায়ক সাভারকর। এ ছাড়াও আইন কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হ'য়েছে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে—মাধব রায়কে।

তাঁদেরও অপরাধ ঐ একই।

এই ভারতীয় ছাত্র সঙ্ঘের বিরুদ্ধ মতামতকে দমিয়ে দেবার চেষ্টায়, পুলিশ প্রথমেই গ্রেপ্তার করল সেদিন বিনায়ক সাভারকরকে।

১৯১০ সালের আর একটি দিন, ১লা জুলাই।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে সেদিনকার সভা। সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে—ভারতের বৃটিশ মন্ত্রী, মলির। ভারতীয়রা সাদর আহ্বান জানিয়েছে তাঁকে;—কিন্তু তিনি এলেন না,—ভারতীয়দের সে আহ্বানে। তাঁর প্রতিভূ হয়ে এলেন তাঁর সমস্ত কাজের ডানহাত—স্যর, কার্জন ওয়াইলি।

ইনষ্টিটিউটের আজ কোনও আসন শূন্য নাই, ফাঁকা নাই কোনও জায়গা। লণ্ডন আর তার আশ-পাশের সকল জায়গার ভারতীয়রাই এসে জড় হয়েছে আজকের সভায়।

কেন আসবে না? এটা যে তাদেরই মনের কথা বলবার জায়গা! শোনাবার জায়গা!

সভার অধিবেশন চলতে থাকে।

ভারতীয়দের মূল বক্তব্যগুলির বিষয় উত্থাপন করা হয় একে একে।

উপস্থিত সকলেই তা শোনে, বোঝেও। কিন্তু উত্তর দেবার ভার স্যর ওয়াইলির!

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ওয়াইলি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে প্রথম শ্রেণীর এক দর্শকের হাতে গর্জন ক'রে ওঠে একটি গুলিভরা পিস্তল, একবার নয়, পর পর কয়েকবার!

লুটিয়ে পড়ে স্যর ওয়াইলির রক্তাক্ত দেহ। রিভলভার হাতে ধরা পড়েন পাঞ্জাবের তরুণ ছেলে মদনলাল ঠিংড়া···পকেটে তার যে কাগজখানি পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল—

—ভারতে নির্মম শাসনের অজুহাতে তরুণদের ফাঁসি ও দীপান্তর দেওয়ার সামান্য কিছু প্রতিফল দিলাম।

বিচারের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ইনিই হাসিমুখে বলেছিলেন—

: Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country"

———

মেঘ ও রোদের খেলা

নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সাত সকালে ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি হল সুরু,
ঝোড়ো হাওয়ার শনশনানি, মেঘের গুরুগুরু।
পাখিগুলো নীড় ছাড়েনি অন্য দিনের মতো।
ব্যাঙের গ্যাঁঙোর-গ্যাঁঙে মুখর পুকুর ডোবা যতো।
দুপুর হতেই দেখি আবার রৌদ্র ঝলোমলো,
নীল-আকাশের চোখের কোণে হাসি টলোটলো।
মুখ ভার ভার এই কালো মেঘ থাকে আকাশ ঘিরে,
হাসি খিলখিল এই রোদ্দুর আবার আসে ফিরে।
মেঘ ও রোদের এই অপরূপ ইন্দ্র দাসের খেলা,
অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এই মেঘ, এই রৌদ্র নিয়ে কবি লেখে ছড়া;
কেউ কি ভাবে এদের দিয়েই মানব জীবন গড়া?

সিন্ধে বনের মাঝে ঢুকে পড়ল হঠাৎ !
আ আআআঃ
একি!
একিসের চীৎকার!
সিন্ধে শব্দ লক্ষ্যকরে ছুটদিলো
মানুষের চীৎকার ! নিশ্চয় ওই দিক থেকে আসছে ! মনে হচ্ছে এই গাছের আড়ালে
দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধে বনের ভিতর এগিয়ে গেলো ।
সিন্ধে গাছের ওপারে গিয়ে
ও কি!
সেই ভয়ঙ্কর সর্দারের মৃত দেহ থেকে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে !

চকিতে সিদ্ধে বন্দুক তুললো·
অবিশ্বাস্য ! নর খাদক ?
কী ওটা ! রাক্ষস ?
নর খাদকটা চকিতে ফিরে দাঁড়লো !
গর্জন করে ওঠে সিদ্ধের বন্দুক !
ব্যাঙ্ক !
প্রচন্ড চীৎকার শোনাগেলো সেই নরখাদকের কণ্ঠে !
আঃ আঃ আঃ
মানুষের মত চীৎকার করে কাঁদছে ! কি ওটা ? কি ওটা ?
সেই চীৎকারে বিমূঢ় সিদ্ধে দ্বিতীয়বার গুলি করতে ভুলে গেলো ...
২২

নাইলন আবিষ্কারের গল্প

আজ থেকে একশ' চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তখন মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী হত তুলা, শণ, রেশম বা পশম থেকে। তুলা মিলত কার্পাস গাছের ফল থেকে, শণ শণ-গাছের ছাল থেকে, রেশম গুটি পোকা থেকে ও পশম ভেড়ার লোম থেকে। ঐ সময়ে পোষাক-পরিচ্ছদ যে এগুলি ছাড়া অন্য কোন উপাদান থেকে তৈরী হতে পারে এ ধরণের কল্পনা মানুষের মনের কোণেও দেখা দেয় নি।

এহেন অবস্থা থেকে প্রথম পরিবর্তন আনেন ফরাসী দেশের এক বৈজ্ঞানিক, —নাম শার্দোনে। তিনি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এক নতুন ধরণের সুতো তৈরী করে ফেলেন। ঐ সুতো দেখতে অনেকটা রেশমের মত। তার মানে রেশমের মত সুন্দর, চকচকে ও মসৃণ। কিন্তু এটা রেশমের মত শক্ত ও টেকসই হয় নি, বিশেষ ক'রে জলে ভেজা অবস্থায়। বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সুতোর নাম দেন কৃত্রিম রেশম।

ক্রমে পৃথিবীর নানা অংশে ঐ নব আবিষ্কৃত সুতোর প্রচার হতে থাকে ও মানুষ পোষাকী কাপড়-চোপড়েই শুধু ঐ সুতো ব্যবহার করে। তার মানে, যেসব ধরণের পোষাক আগে আসল রেশম ব্যবহার করে তৈরী হত, সেখানে এখন কোন কোন স্থলে কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করা সুরু হল। ঐ সময়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি কোন উৎসবে যেত, তাহলে দেখা যেত তারা অনেক স্থলেই কৃত্রিম রেশমের তৈরী ঝলমলে পোষাক পরে ঐ উৎসবে যোগদান করেছে। তার একটা কারণ এই যে, ঐসব পোষাক শুধু দেখতেই সুন্দর হয় নি সেগুলি বেশী ব্যয় সাধ্যও হয় নি। ঐ সুতো বেশ উপযোগী বলে মনে হওয়ার দরুণ ঐ ধরণের আরও অনেকগুলি সুতো একে একে তৈরী করা হয়।

এরপর আবিষ্কৃত হয় নাইলন। এ সুতো উৎকৃষ্ট প্রকৃতির। যেমন দেখতে সুশ্রী ও চকমকে, তেমনি শক্ত। বলতে গেলে ইতিপূর্বে পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরীর ক্ষেত্রে যত রকম সুতো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির ভিতর এর মত সুন্দর ও টেকসই কোনটা নয়। এ সুতো সহজে আগুনে পোড়ে না, পোকায় কাটে না, ঘাম

বা জলে পচে না। এর এত গুণ থাকার দরুণ এর ব্যবহার শুধু পোষাক তৈরীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ থেকে খুব শক্ত দড়ি, মাছ ধরার জাল, নৌকার পাল ইত্যাদিও তৈরী করা হয়।

নাইলনের আবিষ্কারক মার্কিন দেশীয় বৈজ্ঞানিক ওয়ালেশ কেরোথার্স।

কেরোথার্স-এর জন্ম ১৮৯৬ সালে। তাঁর পড়াশুনা সুরু হয় ইলিওনইস্ শহরের একটি স্কুলে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলেজে পড়েন। তাঁর শিক্ষার বিশেষ বিষয় ছিল রসায়ন শাস্ত্র। তাতে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন।

এরপর তিনি একটি স্কুলে মাষ্টারী নেন। কিন্তু কাজটি তাঁর মোটেও পছন্দসই হয় না। তাঁর ঝোঁক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে।

পরিশেষে সুযোগও জুটে যায়। কেরোথার্স ডু পোঁ নামে একটা কারখানার গবেষণাগারে যোগদান করেন।

প্রথম দিকে তিনি মামুলীভাবে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মতন কাজ করে যান। একদিন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। কারখানার মালিকেরা তাঁদের কারখানার বৈজ্ঞানিকদের ডেকে বলেন—'আজ থেকে আপনাদের নিজেদের পরিকল্পনামত কাজ করতে পারেন।'

কথাটা শুনে বৈজ্ঞানিকদের একটু আশ্চর্য লাগল। তার কারণ কারখানার মালিকেরা সাধারণতঃ যে ধরণের গবেষণামূলক কাজ করলে কারখানার লাভ হবে শুধু সেই ধরণের কাজ করতেই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এস্থলে তার ব্যতিক্রম ঘটল কেন? বৈজ্ঞানিকেরা খোঁজ নিয়ে জানলেন, কারখানার আজকাল খুব লাভ হচ্ছে বলে তাঁদের এ ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

যা হোক বৈজ্ঞানিকদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কেরোথার্স ছোট্ট একটি কর্মীর দল তৈরী করেন ও ঠিক করেন কোন একটা বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করে যাবেন।

দুই বছর তাঁরা কাজ করেন। হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য ধরণের সুতো তৈরী হয়ে যায়। সে সুতো দেখতে সুন্দর ও খুব টেঁকসই হয়। ঐ সুতো থেকে কাপড় তৈরী করা হয় ও লক্ষ্য করা যায় ঐ কাপড় শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ নয়, সমুদ্রে-ভাসা নৌকার পাল ও যেসব স্থানে শক্তরকম আঘাত সহ্য করতে

হয় এমনি কাজে ব্যবহারের উপযোগীও হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরণের সুতোর নাম তাঁরা দেন 'নাইলন।'

ক্রমে নাইলনের নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। পরে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে ও সারা পৃথিবীতে নাইলনের উপযোগীতার কথা সকলের মুখে শোনা যায়। আমেরিকা থেকে প্রচুর মাত্রায় ঐ সুতো ও সুতোর তৈরী কাপড় বিদেশে চালান যেতে সুরু করে।

তবে নাইলনের একটা মস্ত খুঁতও চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে তার ঘাম বা জল শুষে নেবার ক্ষমতা সম্পর্কে। এর মানে, নাইলনের গায়ে ঘাম বা জল লাগলে সেটার বেশীর ভাগই সুতোর ভিতর না ঢুকে বাইরে জমে থাকে। এর ফলে নাইলনের জামা পরলে ও ঘামতে থাকলে মানুষ অনেক সময়ে অস্বস্তি বোধ করে। তবে এ ধরণের বিশেষত্বের উপকারিতাও আছে। সেটা কি জান? নাইলনের জামা ধুয়ে শুকিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি সেটা শুকিয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাইলনের দোষ ও গুণ দুই-ই আছে,—তবে দোষের চাইতে গুণের ভাগই বেশী।

তোমরা জান বৈজ্ঞানিক জগতে, কোন এক দেশ কিছু আবিষ্কার করলে অপর দেশও এ বিষয়ে তার অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। নাইলনের বেলাতেও এরূপ ঘটে। সেজন্য দেখা যায় আমেরিকার পরে ইংলণ্ড, কেনেডা ও অন্যান্য বহু দেশও নাইলন তৈরী করতে সুরু করে। ক্রমশঃ চব্বিশটি দেশ এ কাজে নেমে কৃতিত্ব লাভ করে। এগুলির ভিতর ভারতবর্ষও একটি। ভারতে বোম্বাই-এর নিকটবর্তী এক স্থানে ১৯৬২ সনে প্রথম নাইলন তৈরীর কারখানা বসানো হয়। এরপর এ দেশে আরও তিনটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

নাইলন আবিষ্কারের পর অনেকটা এই ধরণের আর এক রকম সুতো গবেষণাগারে তৈরী করা হয়। তার নাম টেরিলিন। টেরিলিনও ভারতবর্ষে তৈরী হচ্ছে।

বর্তমানে পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরীর উপযোগী সুতোগুলির ভিতর নাইলন ও টেরিলিনই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ ধরণের আবিষ্কারের জন্য সারা পৃথিবীর জনসমাজ বিজ্ঞানের জয়গান করে চলেছে। আনন্দের কথা ভারতের বৈজ্ঞানিকেরাও এ ধরণের প্রশংসা লাভ করছেন। এটা কি কম গর্বের কথা? তোমরা কি বল?

———

লোকটির নাম ভিখারী। চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ অবশ্য মোটেই ভিখারীর মত নয়। দিব্যি পাজামা, পাঞ্জাবী ও চপ্পল পরা বাবু বাবু চেহারা।

দাস সাহেব তাঁর জিপ দিলেন জঙ্গল বেড়াতে যাবার জন্যে এবং সঙ্গে দিলেন ভিখারীকে। বন্দুক হাতে সে গিয়ে বসল ড্রাইভারের পিছনে।

হলং জঙ্গল। আকারে ছোট এবং খুব ঘন বা দুর্ভেদ্য নয় কোনখানেই। দু'ধারে চলে গেছে গরান, শিশু ও মেহগেনির গাছের সারি। তার ফাঁকে বড় বড় ঝোপ। বেশীর ভাগই অজানা লতাগুল্মের, যদিও তার অনেকগুলোর মাথায় থোকা থোকা লাল ও বেগুনী রঙের ফুল ফুটে রয়েছে সারা বন আলো করে।

মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা পাহাড়ে নদী, তার নাম ময়ূর। তির তির করে নুড়ি নাচিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। এক হাতও হবে না গভীর, কিন্তু কি তোড় জলের! পা রেখে দাঁড়ান যায় না, উল্টে ফেলে দেয়।

এই নদীর পারে বাঁধা পথ ধরে এসে দাঁড়াল জিপ। আকাশে তখন নেমেছে সন্ধ্যার ছায়া। দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে রকমারি পাখীর আওয়াজ। আর আসছে জংলা জলপাইগুড়ীর দমকা বাতাস, যাতে ফাল্গুনী ফুলের গন্ধ জড়ান।

আমি বললাম—ভিখারী, তাহলে ডান পাশের ঐ কেবিনেই আশ্রয় নেওয়া যাক চল। এখন আর নদী পেরিয়ে অন্ধকারে বেশী এগুতে চাই না। শুনেছি

হাতী আর বাঘেরা এই সময়ই জল খেতে আসে।

ভিখারী বলল—না, না। এখন ওদের জল খাবার সময়ই নয়। ওরা বের হয় মাঝ রাতে, যার যা খাবার খায়, তারপর নোনা মাটি চাটে। আর জল খায় ভোর রাত্রে। যেতে না চান থাক, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমি ত হর্দম যাই।

ভিখারী প্রৌঢ়, আমি যুবক। সে যখন ভয় পাচ্ছে না, তখন আমার ভয় পাওয়াটা কি শোভন হবে?

বললাম—বেশ চল। দু'জনে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ময়ূর নদী পার হয়ে ওপারের গাড়া কিনারায় উঠলাম। চারদিক তখন অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে গেছে, আর সেই অন্ধকার কাঁপিয়ে উঠছে ই-ই, রি-রি শব্দ ঝিঁঝিদের।

ভিখারী আগে আগে বন্দুক হাতে, আমি টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে চলেছি তার পিছনে।

ভিখারী বলল—হাতী যদি আসেই, ডানে হক বাঁয়ে হক বেঁকেই দেবেন বনের ভেতর দৌড়। ওরা সিধে চলে, সিধে দেখে, আশেপাশে ফেরে না।

—আর বাঘ, আমি বললাম।

—বাঘ? বাঘ দেখা মাত্র হাতের কাছের বড় গাছে সড় সড় করে উঠে পড়বেন। বাঘ এসে তার গোড়া আঁচড়াবে, কিন্তু উঠতে পারবে না।

উপদেশ দু'টো মনে মনে বেশ করে ভেবে নিলাম। কারণ যতই বড় গলা করে ভরসা দিক ভিখারী, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল হাতী এবং বাঘেরা এই সময়ই বেরয় জল খেতে।

আধ মাইল মত এসেছি দু'জনে। পিছু ফিরে দেখলাম জিপের আলো দু'টো জ্বলছে দু'টো বড় বড় রাক্ষুসে চোখের মত। এপারটা ওপারের চেয়ে ঢালু, তাই আলোটা অনেকটাই এসে পড়েছে আমাদের পথের ওপর।

হঠাৎ সামনে হাত-কুড়ি দূরে কি দেখলাম ওটা? হাতী? পিছনের অংশটা জঙ্গলের ভেতর রয়েছে, পথের ওপর সামনের দিকটা। অন্ধকারে শুঁড় নাড়ছে, আর ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে তা থেকে কামার শালার হাফরের মত।

অসাবধানেই হাতের টর্চটা টিপেছিলাম একবার। তাতে দেখলাম, এক রাশ ঘাসের একটা বোঝা পড়ে আছে এক পাশে, আর তার নীচে মুখ থুবড়ে

পড়ে আছে একজন কুলি গোছের মানুষ। তার মাথা ও মুখ মনে হল রক্তে মাখা।

বুঝলাম এবং চমকে দেখলাম আশেপাশে কোথাও ভিখারী নেই। মুহূর্ত মধ্যে গলা শুকিয়ে হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। চোখের সামনে ফুটতে লাগল রাশি রাশি আলোর ফুলকি। কি করি এখন? দৌড়লেও হাতী পিছু তাড়া করবে, দাঁড়িয়ে থাকলেও ঐ ঘেসুড়ের মত আছড়ে মেরে ফেলবে।

ভিখারীর উপদেশটি তখন আর মনেই পড়ল না। পায়ের জুতো ফেলে দিয়ে সোজা হাতের কাছের ঝাঁকড়া বাদাম গাছটায় উঠে পড়লাম বানরের মত তড়াক করে।

বেশ অনেকটা উঠে হাঁক দিলাম, কৈ ভিখারী, কোথায় তুমি?

বনের গভীর থেকে প্রতি ধ্বনি এল ই-ই করে। কিন্তু ভিখারীর আওয়াজ শুনলাম না। টর্চ ফেলে দেখলাম রাস্তার ওপর বন্দুকটা পড়ে আছে। তাহলে? লোকটাকে কি বাঘে টেনে নিয়ে গেল? গেল কোথায় সে?

ডালে বসে হাতীর দিকে টর্চ ফেললাম দু-তিনবার। ভীষণ একটা চীৎকার করে উল্টো দিকে দৌড় দিল সে এবং মিনিট পনেরর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল সম্পূর্ণ।

তখন কি করি? অসীম সাহসে গাছ থেকে নেমে এসে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম রাস্তা থেকে। পিছু হটতে হটতে ময়ূর নদীর ধারে এলাম, ধীরে ধীরে

নদী পার হয়ে জিপে এসে উঠলাম তারপর। আলো দু'টো তার সেই রকমই জ্বলছিল।

কিন্তু ও কি? জিপের ডাইভারও নেই এবং জিপ থেকে ডান দিকের জঙ্গল পর্যন্ত চলে গেছে তাজা একটা রক্তের ধারা। তাহলে কি বাঘে নিয়ে গেছে তাকেও? তিন তিনটে মানুষ প্রাণ হারাল তাহলে এইটুকু সময়ের মধ্যে!

নিরুপায় হয়ে একাই জিপ হাঁকিয়ে এসে উঠলাম ফরেষ্টার সাহেবের বাংলোয়।

তিনি দু'জন বন্দুকধারী নিয়ে আমারই খোঁজে বেরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন আর একখানি জিপ নিয়ে।

বললেন—বলে দিয়েছিলাম দাস সাহেবকে যে নদীর শ'খানেক হাত দূরের কেবিনে যেন আপনারা আস্তানা নেন। সে কথা না শুনে নদী পার হলেন কেন?

আমি বললাম—দাস সাহেব কিছু বলেন নি ত। তাছাড়া ভিখারী ভরসা দিল যে!

মুখে একটা শব্দ করে তিনি বললেন—ওর কথা আর বলবেন না। একের নম্বর কাপুরুষ। আপনাকে একা ফেলে রেখেই ও আর ড্রাইভার পালিয়ে এসেছে।

জিপে রক্তের দাগ দেখলাম যে, সবিস্ময়ে বললাম।

তিনি বললেন—একটা পাঁঠা নিয়ে গিয়েছিল টোপ হিসাবে। সেটাকেই হুঁড়াবে টেনে নিয়ে গেছে ফাঁকা গাড়ী পেয়ে। ও কিছু নয়।

বললাম—ঘেসুড়েটাকে ত হাতীতে মেরে ফেলেছে। তার দেহটা পড়ে আছে। দেখলাম ওপারের রাস্তায়।

তিনি হেসে বললেন—আরে না, না। জঙ্গলের ঘেসুড়েরা অত বোকা নয়। একটা পাগলা হাতী উৎপাত করছে কদিন থেকে। তাকে ফাঁকায় বের করে আনার জন্যে নকল মানুষ ফেলে রেখেছি একটা। ওটা দেখে তেড়ে এলেই গুলি করা হবে।

তারপর পাইপ ধরিয়ে বললেন—যাচ্ছি ওটার খোঁজেই। যাবেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলাম। গাড়ী ছুটল। দেখলাম কেঠো বাংলোর এক-তলায় বসে বসে ড্রাইভার আর ভিখারী দাবা খেলছে। দেখে রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললাম!

———

আগে বলতে হয়!

কুমারেশ ঘোষ

আমার দাদামশাই ছিলেন প্লীডার কমিশনার।

মানে, জমি নিয়ে দু'পক্ষের ঝগড়া বাঁধলে বা মামলা শুরু হলে, তিনি তাদেরই এক পক্ষের হয়ে সেই জমি মেপে এসে তার নক্সা তৈরী করে, তার হয়ে কোর্টে ওকালতি করতেন।

আবার অনেক সময় গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কোন জমি জরীপ করে তার নক্সা বা প্ল্যান তৈরী করতেন।

এজন্য দাদামশায়কে প্রায় কুষ্টিয়া শহর (সেইখানেই তিনি থাকতেন) থেকে দূরে গ্রামে বা মাঠে ঘাটে যেতে হতো। তার সংগে থাকতো মুহুরী পূর্ণ। পুরো নাম পূর্ণচন্দ্র পাল, আর সংগে যেতো চাপরাশী খোরজান।

লোকটা ছিল জাতে মুসলমান; আমরা তাকে মামা বলতাম। এখনো মনে আছে, তোতলা ছিল খোরজান মামা।

জমি জরীপ করবার কাঁটা, কম্পাস, চেন আর তেপায়া ষ্ট্যাণ্ড নিত খোরজান মামা, পূর্ণবাবু নিতেন লম্বা গোল করে জড়ানো কাগজ, আর দাদামশায় নিতেন সাদা রঙের একটি ছাতা।

দাদামশায়ের জুতো জোড়া ছিল জাহাজের মত। আর কি ভারী! একবার জুতোজোড়া তার পায়ের সামনে এগিয়ে দিতে গিয়ে মনে হয়েছিল, ওজন সের পাঁচেক তো হবেই। আর জুতো জোড়ায় কালি দেবার কোন হাঙ্গামাই ছিল না।

মাঠে নেমে জমি জরীপ করা মানে যে শুধু পায়ে কাদা লাগানো, তা নয়। চেন ধরাধরি করতে গিয়ে হাতে কাদাও লাগার সম্ভাবনা, আর লাগতোও।

কারণ দাদামশায় কারোর মুখে ঝাল খেতেন না। মানে, অন্যকে দিয়ে মাপিয়ে ঘরে বসে বা দূরে বসে নক্সা তৈরী করতেন না, নিজেই নামতেন মাঠে।

একবার এক গ্রামের হাটের কাছে এক জমি জরীপ করতে সদলবলে গেলেন দাদামশায়। তার আগের দিন বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠে জল কাদা। তবু দাদামশায় দমলেন না। চেন ধরাধরি করবার জন্যে বাড়তি লোকজন থাকা সত্বেও

নিজেই নামলেন মাঠে—নিজের চোখে মাপ দেখবার জন্য।

ঘণ্টা দু'য়েক কাজকর্ম করবার পরে আবার ফিরে এলেন হাটে। হাটে ধান চালের দোকান, মুদীর দোকান, খাবারের দোকানও ছিল। দাদামশায় বললেন পূর্ণবাবুকে—পুন্নু, এসো কিছু খেয়ে নি আমরা।

পূর্ণবাবু আর কি বলবেন! চুপ করে রইলেন।

দাদামশায় বললেন—হাতে পায়ে কাদা লেগেছে চলো আগে ধুয়ে নিই।

সামনেই মুদীখানার দোকানটার দিকে পেছনে পূর্ণবাবু আর খোরজান মামা চলেছে।

ছ'ফুট লম্বা বিরাট পুরুষ দাদামশায়। পাকা চুল, ছাঁটা গোঁফ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হাতে ছাতা, দাদামশাইকে দেখে মুদীর দোকানের দোকানী সাদরে ডাকলো তাঁকে—আসুন বাবু, আসুন।

দাঁড়াও জল আনো, হাতটা ধুয়ে নিই। এই যে জল—বলেই সামনে রাখা ভরা টিনে হাত ডুবিয়ে দিলেন।

—আরে, আরে বাবু করেন কি? দোকানী হাঁ-হাঁ করে উঠলো—ও যে সাদা কেরোসিন তেল!

কেরোসিন তেল!—দাদামশায় আশ্চর্য অপ্রস্তুত হলেন না, বরং দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—আগে বলতে হয়! যতসব···

এ হে!—পূর্ণবাবু বরং অপ্রস্তুতে পড়লেন।

বা—বা—বা—খোরজান মামা হয়তো তোতলামী করে বলতে যাচ্ছিল, তা বাইরে রেখেচো কেন?—

কিন্তু তাড়া খেলেন দাদামশাইয়ের কাছে: আর ব্যা-ব্যা করতে হবে না। কৈ হে, জল দাও। উল্টে যেন দোকানী কত অপরাধী।

তা সত্যিই নিয়ে এলো দোকানী মগে ভর্তি জল আর সাবান একটা। দাদামশায় হাত ধুতে ধুতে বললেন—নাঃ, তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কোন কালেই হবে না। দাও গামছা দাও।

দোকানী এগিয়ে দিল গামছা।

হাটের আর পাঁচজন লোক কাণ্ড দেখে হাসছিল। কিন্তু দাদামশায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। বললেন—দেখি, তোমার কি খাবার আছে?

দাদামশায় বললেন—দাও এক সের রসগোল্লা, আর আধ সের রাঘবসই, আর তেলের দামটা ধরে নিয়ো।

দোকানী বললো—আজ্ঞে, ওটা আর দিতে হবে না।

———

বীর কিশোর

শৈলেন দত্ত

ইতালীর উত্তর প্রান্তের টাইরাল দেশ তখন বড় বিপন্ন। বড় বিপদগ্রস্ত।

ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করেছে টাইরোলের বিরুদ্ধে।

সরল সাদাসিধে শান্তিপ্রিয় টাইরোলের মানুষ। চাষবাস করে, মাঠে মাঠে গরু চরায়, নদীতে সাগরে মাছ ধরে, সহজ সাধারণ অনাবিল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বয়ে যায় তাদের শান্ত নিরবিচ্ছিন্ন জীবন। নিজের নিয়ে তারা ব্যস্ত, সারাদিন মাঠে ঘাটে খেটে যে দু'মুঠো মাছ-ভাত জোটে তাতেই তারা তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। অন্য দেশের প্রতি তাদের লোভ নেই, বাহির বিশ্বের নিত্য পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের প্রতিও টাইরোল-বাসীদের তেমন কোন আগ্রহ নেই।

টাইরোল দেশে সভ্যতার তেমন কোন আঁচড় তখনও পড়ে নি। ঘড়ির কাঁটা এখানে ধীর পায়ে চলে। রয়ে বসে গড়িয়ে বয়ে যায় টাইরোলের দিন, টাইরোলের রাত্রি।

কিন্তু সেই টাইরোলের শান্ত নিরবিচ্ছিন্ন জীবনেও একদিন যুদ্ধের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর ভারী বুটের পদশব্দে মুখর হয়ে উঠল টাইরোলের গ্রাম-গঞ্জ, পথ প্রান্তর। যুদ্ধের বিভীষিকায় শিউরে উঠল টাইরোলের শান্ত নির্বিবাদী মানুষ। ভয়ে দুরু দুরু বুক। পথে ঘাটে বড় একটা কেউ বেরয় না। সন্ত্রাসের ছায়ায় ঘরে ঘরে থির থির করে কাঁপছে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ। ওদের প্রতিবাদের ভাষা নেই, প্রতিরক্ষার তেমন কোন প্রস্তুতিও নেই। ভাগ্য দেবতার হাতে জীবনটা সঁপে দিয়ে ওরা যেন বসে আছে।

ঘর ঘর পুড়ছে। গ্রাম গ্রাম জ্বলছে। শিশু-যুবা-বৃদ্ধ মরছে তো মরছেই।

এভাবে কতদিন মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করা যায়।

আর নয়। দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করতে হবে। মরতে যদি হয় লড়াই করেই মরব। ভীরু কাপুরুষের মত এইভাবে প্রাণ দেব না।

—টাইরোলের এক বীর স্পেকবেচার এবার গর্জে উঠলেন, গ্রাম শহরের মানুষকে ডাক দিলেন প্রতিরোধের লৌহ কঠিন আহ্বানে।

নির্জীব নির্বীর্য ঘুমন্ত জাতিটা যেন বীরের ঐ বজ্রকণ্ঠে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। ওদের বুকের পাঁজরে আগুন জ্বলে উঠল। রক্ত প্রবাহে ঝড়ের মাতন লাগল।

ক্ষেতের চাষী, নৌকোর মাঝি, গ্রাম শহরের খেটে-খাওয়া মানুষ শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, আমরা লড়াই করেই মরব।—হাজারো মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার হ'ল এই রণধ্বনি।

অ্যালবার্ট স্পেকবেচার। মাত্র দশ বছরের ছেলে। সে ঐ টাইরোলিস বীরের ছেলে। জননী জন্মভূমি রক্ষার জন্যে সেও মনে মনে শপথ নিল নিঃশঙ্কচিত্তে ছায়ার মত অনুসরণ করল পিতা স্পেকবেচারকে।

ফরাসী সৈন্যরা এসে তখন একটা গ্রাম আক্রমণ করেছে। একদিকে সেই ফরাসী সৈন্যদল, আর অপর দিকে সেই গ্রাম। মধ্যে একটা বিরাট খাদ। খাদের তলদেশে খরস্রোতা নদী আর্ড ঝর ঝর ঝর ঝর করে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে। খাদের গায়ে পাথরে পাথরে আছড়ে পড়ে সেই স্রোত ফুঁসে উঠেছে, ফেণায় ফেণায় ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামে পৌঁহানোর একমাত্র পথ একটা সেতু। সেতুটাও আবার মানুষের তৈরি নয়। প্রকৃতি আপন খেয়ালে যেন ওটা তৈরি করেছে। মস্ত একটা গাছ খাদের এ পারের গায়ে দাঁড়িয়ে। ওর মস্ত মস্ত ডালপালা গিয়ে ঠেকেছে ওপারের প্রান্তে। গাছের কাণ্ড বেয়ে একজন মানুষই ঐ গাছের সেতু ধরে ওপারের গ্রামে যেতে পারে।

ফরাসী সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাজির হ'ল ওপারের খাদের ধারে। টাইরোলিসেরাও প্রস্তুত। যে কোন মূল্যেই হোক ওরা ওদের গ্রামকে রক্ষা করবে। জান দেবে তবু জন্মভূমি ছাড়বে না। পিতা স্পেকবেচারের নেতৃত্বে ওরা তিনশ' টাইরোলিস এসে জমায়েত হ'ল অপর প্রান্তে। ওদের হাতে বিষাক্ত তীর, বর্ষা বল্লম। ফরাসীদের হাতে বন্দুক, গুলিগোলা। স্বল্প দূরগামী বন্দুক বলে রক্ষে! গুলি এ প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ পৌঁছচ্ছে না! তুমুল লড়াই চলেছে দু' পক্ষে। ধোঁয়ায়, বারুদের গন্ধে গ্রামের আকাশ ভরে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে গ্রামবাসীরা।

দশ বছরের শিশুপুত্র অ্যালবার্ট স্পেকবেচারও রয়েছে টাইরোলিসদের মধ্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে লড়াই। ওই শিশু হৃদয়ও ক্রমশঃ অগ্নিময় হয়ে উঠছে।

হিংস্র নেকড়ের মত ক্ষেপে গেছে ফরাসী সৈন্যরা। তবু সেতু পেরিয়ে কিছুতেই ওদের নিশ্চিহ্ন করতে পারছে না।

দু'টো কামান টেনে নিয়ে এসো পাহাড়ের ওপর। কামান দাগো।—গর্জে

উঠলেন ফরাসী সেনানায়ক।

তথাস্তু। তাই করা হ'ল।

কামানের গোলার মুখে টাইরোলিসেরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। দলে দলে মারা পড়ল। প্রায় দেড়শত টাইরোলিসেদের সঙ্গে বীর সেনানায়ক স্পেকবেচারও জন্মভূমির মাটিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রক্তে রঞ্জিত হ'ল টাইরোলের পবিত্র মাটি।

কিন্তু আলবার্ট বাবার মৃত্যুশয্যার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। মনে মনে বাবার কাছে দেশপ্রেমের দীক্ষা নিল।

এতক্ষণ ধরে সে লক্ষ্য করেছে তার গ্রামবাসীরা প্রাণপণে সেতুটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। ওটা ভাঙতে পারলে ফরাসীরা ঐ বিশাল খাদ ডিঙিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারবে না। কুড়ুল নিয়ে ওরা ঐ গাছটার গুঁড়ি কাটতে শুরু করেছিল। কিন্তু গোলায় গুলিতে তারা অনেকেই মারা পড়েছে। যারা অবশিষ্ট আছে তারাও শ্রান্ত, অবসন্ন। সাহসে কুলচ্ছে না।

ইতিমধ্যে গাছের গুঁড়িটার অনেকটাই কিন্তু কাটা হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও গাছটা বেশ শক্তভাবে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে আছে।

আলবার্ট পায় পায় বাবার মৃতদেহের দিকে আবার এগিয়ে গেল। ওঁর সাদা মুখমণ্ডলের দিকে অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে একবার তাকাল। তারপর মাথা উঁচু ক'রে আকাশের দিকে তারপর কুড়ুলটা শক্ত মুঠিতে ডানহাতে তুলে নিল। ঠিক সেই সময় এক ঝাঁক বুলেটের গুলি ছুটে এল তার দিকে। ফরাসী শয়তানরা ঠিক লক্ষ্য করেছে তাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটা গুলিও ওর দেহ স্পর্শ করতে পারল না।

ঘায়ের পর কুড়ুলের ঘা মারল আলবার্ট প্রাণপণ শক্তিতে। গাছটা কাটা প্রায় শেষ। কেবল এক জায়গায় আলতোভাবে একটু লেগে আছে। ভেতরের দিকের গাছের ছালের একটা অংশ মাত্র। শিশু আলবার্ট কিছুতেই ওদিকটার নাগাল পাচ্ছে না।

শিশু আলবার্ট ভাবছে কি করে ওটাকে ছিন্ন করা যায়। সাত পাঁচ ভেবে ও স্থির করল একটা ভারী জিনিষ ও-দিকটা ঝুলিয়ে দিলে ওটা ছিন্ন হবে। গাছটা ভেঙে পড়বে।

তির তির করে প্রতীক্ষার কয়েকটা প্রহর কেটে গেল। ফরাসীদের বুলেটের গুলি কখন ফুরায় তারই প্রতীক্ষা। এক সময় বন্দুকের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল। ফরাসীরা বুলেটে আবার গুলি ভরার জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। আলবার্ট আর অপেক্ষা না ক'রে এক লাফে গাছের সেই দিকটা ধরে ঝুলে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ শক্তিতে হেঁচকা একটা টান মারল।

মট্ মট্ মটাৎ। সশব্দে গাছটা ভেঙে পড়ল। আর তার সঙ্গে শিশু আলবার্টও। মস্ত গুঁড়িটা সমেত আলবার্ট গিয়ে পড়ল খাদের নীচের সেই অথৈ জলে। বিরাট ঢেউএ গিয়ে গাছ সমেত আছড়ে পড়ল আলবার্ট।

জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্যে শিশু আলবার্ট নিজেকে উৎসর্গ করল।

সারাদিন গুলি বর্ষণ ক'রে, কামান দেগেও ফরাসীরা গ্রামের মাটি স্পর্শ করতে পারল না। বিফল হয়ে ফিরে গেল। ওখানে যাবার একমাত্র পথ ঐ গাছের সেতুটাকেই যে ভেঙে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে শিশু আলবার্ট।

পরের দিন। ভোর বেলা। পুব আকাশে সূর্য সবে মুঠো মুঠো আবীর ছড়াচ্ছে। ভোরের সেই রাঙা আলোয় ফরাসীরা এসে দেখল নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে শিশু আলবার্টের নিঃসাড় হিমশীতল দেহটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পড়ে আছে। যেন বিরাট এক কর্তব্য শেষ করে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আলবার্ট।

ওরা শত্রু, আলবার্টের মাতৃভূমি আক্রমণকারী। তবু আলবার্টের এই দেশপ্রেম দেখে ওদের পাষাণ হৃদয়ও গলে গেল। বীরত্বের এক জ্বলন্ত বিগ্রহ যেন, আলবার্ট।

ফরাসীরা হাত ধরাধরি করে ওকে কোলে করে তুলে নিয়ে এল। পাহাড়ের গায়ে ওকে বীরের সম্মান দিয়ে সমাধিস্থ করল। তারপর প্রস্তরের একটা সমাধি স্তম্ভ রচনা ক'রে ওর গায়ে লিখে রেখে গেল শিশু আলবার্টের বীরত্বের কাহিনী। দেশ দেশান্তের মানুষ আজও ইতালীর টাইরোলের বনে জঙ্গলে আকীর্ণ এই সমাধি স্তম্ভ দেখে স্বদেশী প্রেমের দীক্ষা নেয়, শ্রদ্ধায় শিশু আলবার্টের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

———

শ্রীজ্যোতির্ময় গুই

ছোট বোন মিলি ইংরেজী খাতা হাতে করে প্রদীপের পড়ার ঘরে ঢোকে—'দাদা, চিনির ইংরেজী কি ?'

প্রদীপ এবছর বি, এ, ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে, নিজের পড়া নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল। বই থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—'সুগার।'

মিলি দাদার আরো কাছে এগিয়ে আসে—'বানানটা বলো।'

প্রদীপ এবার মুখ তোলে—'তুই কিরে, কি করে তুই সেভেনে প্রমোশন পেলি। নে লেখ—s, u, g, a, r।

মিলি বকুনি খেয়ে মন-মরা হয়ে যায়। বানানটা লিখে খাতা বন্ধ করে অভিমান-ভরা চোখে দাদার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

প্রদীপ তার এই ছোট্ট বোনটাকে খুব ভালবাসে, রূঢ় কথা বলে ফেলে সেও দুঃখ পায়। হঠাৎ সে তার হাতের বইটা বন্ধ করে সস্নেহে ডাক দেয়—'শোন মিলি।'

মিলি ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদার দিকে তাকায়।

—'বোস ঐ টুলটায়, গল্প বলি শোন।'

গল্পের নামে মিলির মন থেকে মেঘ কেটে যায়, মুখে হাসি ফোটে ; দাদার টেবিলে খাতাটা রেখে দিয়ে পাশের টুলটায় বসে পড়ে।

প্রদীপও ভালো করে জাঁকিয়ে বসে আরম্ভ করে—'এই sugar শব্দটা যদিও এখন পুরোপুরি ইংরেজী শব্দ, কিন্তু এর উৎপত্তি কোথা থেকে জানিস ? শুনলে অবাক হবি ; এর উৎপত্তি হচ্ছে, সংস্কৃত শর্করা থেকে। সংস্কৃত শর্করা থেকে ফার্‌সী shaker, তারপর ফার্‌সী থেকে স্প্যানাশ, স্প্যানিশ থেকে ফরাসী আর সবশেষে ফরাসী থেকে ইংরেজী শব্দে রূপ পেলো sugar'। প্রদীপ মাষ্টারী করার

এমন সুন্দর সুযোগ পেয়ে আর এরকম নিরীহ ছাত্রী পেয়ে (ছাত্রী যদিও ঐরূপ নীরস আলোচনায় মোটেই উৎসাহ না পেয়ে দাদার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে) গম্ভীরভাবে বলে চলে—'এরকম ইংরেজী শব্দ আরো অনেক আছে, যেগুলো বিভিন্নদেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়ে অবশেষে ইংরেজীতে একটা স্থায়ীরূপ পেয়েছে। যেমন কারফিউ কথাটা শুনে থাকিস, কাগজেও পড়ে থাকবি আর তার মানেও বোধ হয় জানিস যে, একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমায় শান্তি-ভংগের আশংকায় বাড়ীর বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ, তাই না? এটা ফরাসী শব্দ couvre feu থেকে এসেছে, যার মানে হলো cover fire অর্থাৎ আগুন নিবিয়ে ফেল এবং কোনরকম আলো না জ্বালা একটা সংকেত-ধ্বনি ঘোষিত হওয়া মাত্র। ইংরেজীতে curfew অবশ্য যা বললাম ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার ধর Telephone শব্দটা, ঐ যে বাবার ঘরে টেলিফোন্ রয়েছে, যার সাহায্যে বাবা দূর দূরান্তের লোকের সংগে কথা বলেন বা তাদের কথা শোনেন। এই শব্দটা দু'টো গ্রীক শব্দের মিলনে উদ্ভূত হয়েছে—Tele মানে দূর আর phone মানে শব্দ অর্থাৎ কিনা দূরের শব্দ, বুঝলি তো? আচ্ছা, বয়কট করা কথাটা তোরা প্রায়ই ব্যবহার করিস, তাই না? মানে কাউকে এড়িয়ে চলা। এই শব্দটার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডের এক জমিদারের ক্যাপ্টেন বয়কট নামে এক কর্মচারী অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রজাদের কাছ থেকে জমির খাজনা ও বাড়ীভাড়া আদায় করতো। ক্যাপ্টেন বয়কট নিজের ব্যবহারের গুণে জনসাধারণের কাছে এত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে সবাই তাকে ঘৃণাভরে এড়িয়ে চলতো অর্থাৎ এখনকার ভাষায় captain boycott was boycotted. এরপর বয়কটের মতো কোনো নির্দয় ও ঘৃণ্য প্রকৃতির লোককে এড়িয়ে চলার প্রশ্নে 'বয়কট' শব্দটি ব্যবহার হ'তে লাগলো। তাছাড়া, সবচেয়ে মজার হলো sandwich শব্দের উৎপত্তি। আর্ল স্যাণ্ডউইচ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক দু'খণ্ড রুটির মাঝখানে কিছু মুখরোচক খাবার রেখে খেতে ভালবাসতেন। আর পরবর্তীকালে ঐভাবে প্রস্তুত খাবার 'স্যাণ্ডউইচ' নামে চলতে লাগলো। বেতনের ইংরেজী কি তুই জানিস বোধ হয়।

—হ্যাঁ, বেতনের ইংরেজী হলো, salary।

—হ্যাঁ, এই salary শব্দটি এসেছে রোম্যান শব্দ salarium থেকে। এরও

একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে রোমে সৈন্যবাহিনীর লোকদের লবণ বা salt কেনার জন্য একটা একটা ভাতা দেওয়া হতো যার নাম ছিল salarium ; হঠাৎ কোনো একজন কোনো একদিন তার মাসের সমগ্র উপার্জনকে salarium বলে ফেলেছিল আর তারপর থেকে মাস-মাইনের জায়গায় salarium কথাটির ব্যবহার এবং তারই ইংরেজী রূপ হলো salary। আর একটা ইংরেজী শব্দ company, এ কথাটাও তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস, কারণ বাবাই তো একটা মার্চেণ্ট কোম্পানীতে কাজ করেন। এই শব্দটা এসেছে companion থেকে, যার মানে হলো সংগী বা সহচর। আবার এই companion শব্দের উৎপত্তি দুইটি ফরাসী শব্দের মিলন থেকে। ফরাসী শব্দ com মানে হলো সহিত আর panis মানে রুটি। অর্থাৎ companion হলো সে লোক যার সংগে তুমি একসাথে রুটি খেয়েছো। আর company শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো এমন কতকগুলি লোকের সমাবেশ যারা মিলিতভাবে তাদের রুটি খেতে চাইছে। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা, তাই না?

এরকম বহু ইংরেজী শব্দ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে। ইংরেজী ভাষা বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা, এর একমাত্র কারণ ইংরেজী ভাষার উদারতা অর্থাৎ সে সব স' া অন্য যে কোনো ভাষা থেকে সুন্দব ও জোরালো শব্দ সংগ্রহ করে নির্দ্বিধায় ার বুকে ঠাঁই দিয়েছে।

হঠাৎ রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক শোনা যায়—'ওরে মিলি, কোথায় গেলি? তোর বাবার আর দাদার চা দিয়ে আয়।

মিলিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, গল্পের নামে দাদার শব্দ-তত্ত্বের কচকচানি তার একদম ভালো লাগছিল না।

চায়ের কথা শুনে প্রদীপও উল্লসিত হয়ে ওঠে—যা, যা তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয়।

মিলিও ছুটে পালায় দাদার কাছ থেকে, না দাদার শব্দ-তত্ত্বের কাছ থেকে, কে-জানে?

———

অদ্ভুতদের কাণ্ড

মোহন মিত্র

অকর বকর ধাঁইকি ধাকর
রাস্তা ভেঙে ফাঁক,
ঝিকির ঝিকির মেসিন চলে
দুপুর জ্বলে খাক।

ডেক্‌চি নড়ে নাকড় নাকড়
বাঘে খেল শাক,
ঠকাস ঠকাস খড়ম চলে
পেঁচার লম্বা নাক।

তেঁতুল খেয়ে বাগ্‌দি বুড়ি
আসছে তেড়ে তেড়ে ;
আকাশটাকে কাছে পেলেই
ফেলবে বুঝি ফেঁড়ে।

বড় বড় জুলপি রেখে
হিপি হ'ল দাদা,
কিম্‌ভূতগুলো অদ্ভুত হয়ে
মজায় মাখে কাদা।

আজব দেশে

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

এক যে আছে আজব দেশ,
নয়কো সবে ভালো,
দিনে সবাই জ্বালায় বাতি,
রাত্তিরে নেই আলো।

সেইখানেতে ছোটরা সব,
এমন পাজি, দস্যি,
বাজবাড়ীতে ঘুমোয় রাজা,
তার নাকে দেয় সুস্যি !

কিন্তু যখন পড়ে ধরা
বেজায় জোরে কান্না,
অমনি তাদের চোখের জলেই
মুক্তো, হীরে, পান্না !

আজব এমন দেশটা দেখার,
ইচ্ছে যাদের হবে,
আংলা বুড়োর বাংলা খাতায়
সেই ঠিকানা পাবে।

বুড়ো সৈনিক

নিখিল সেন

এক ছিল বুড়ো সৈনিক।

বারো বছর ধরে লড়াই করে আসছে সে একনাগাড়ে। বয়স হয়েছে। একদিন তাই সেনাপতি তাকে ডেকে বললেন—'এতদিন তো লড়াই করলে, তোমার মত যোদ্ধা আমি আর খুঁজে পাই নি। তুমি হলে আমার সেরা সৈনিক। এবার তোমার ছুটি। কী চাই বলো, তোমায় দিচ্ছি।

এই বলে সেনাপতি ওকে দিলেন সুন্দর একটি সাদা ঘোড়া, ধূমপানের জন্যে তিনটি সুন্দর হুঁকো আর পথ খরচার জন্যে কিছু পয়সা-কড়ি।

তাই নিয়ে বুড়ো সৈনিক বিদায় নিলে। ঘরে তার থাকবার মধ্যে কেউ নেই। সেনাদলই ছিল এতদিন তার ঘর-বাড়ি। পুরনো বন্ধু-বান্ধব, মাঠ পল্টনের কাছ থেকে তাকে আজ বিদায় নিতে হবে। ছেড়ে আসতে হবে সবাইকে।

বুড়ো সৈনিকের মন তাই খুব খারাপ হয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে বনের পথ ধরে সে বাড়ি চলল নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে। পথে সহসা দেখা হল এক বুড়ো ভিখারীর সঙ্গে। ভিখারীটি বুড়ো সৈনিকের কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে।

আমি হলাম একজন সৈনিক। সেনাদলে যখন ছিলাম, তখন আমার অধীনে অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল বটে। এখন আমার ছুটি হয়েছে। সেনাপতি আমায় ছুটি দিয়েছেন। সুন্দর এই ঘোড়াটি উপহার দিয়েছেন। আর দিয়েছেন তামাক খাবার জন্যে তিনটি হুঁকো আর কিছু টাকাকড়ি। এখন ভিখারীকে আমি কি দিই, হে ঈশ্বর!

বুড়ো সৈনিক বিড়বিড় করে উঠল আপন মনে।

ভিখারীটি আবার বলে উঠল—'আমায় কিছু দাও গো, খাওয়া হয় নি।'

—'তোমায় এখন কী দিই বলো তো? একটু আগেই তো আরও চারজন ভিখারীকে বিদায় করতে হল।' বুড়ো সৈনিক বলে উঠল। পরে তার থলে থেকে খাবারের শেষ কণাটুকু ওর হাতে গুঁজে দিলো। বলল—'এই নাও! আমার আর

কিছু নেই। যা ছিল সব আগে বিলিয়ে দিয়েছি। ঘোড়া, টাকাকড়ি যা পেয়েছিলাম সবই।'

বুড়ো সৈনিক আবার পথ ধরে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে আর এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা। ভিখারীটি তখন কিছু চাইলে হাত পেতে। বললে—'দাও গো, কিছু দাও! খাওয়া হয় নি অনেকদিন।'

বুড়ো সৈনিক তখন বলে উঠল—'হায় ভগবান! আমি এখন কি দিই বলো ত! সুন্দর ঘোড়াটি, টাকাকড়ি যাকিছু পেয়েছিলাম সবই তো বিলিয়ে দিয়েছি। আমার যে আর কিছু দেবার নেই। ঈশ্বরই এখন আমার একমাত্র ভরসা।'

বুড়ো সৈনিকের কথা শুনে ভিখারীর মনটি বুঝি গলে গেল। একটু হেসে সে তার রূপ বদলাল। বললে—'সৈনিক, আমি তোমার উপর খুব খুশী হয়েছি। চেয়ে দেখ আমি ভিখারী নই। দেখ আমি কে!'

...বুড়ো সৈনিক তখন তাকিয়ে দেখে কি—সত্যিই তো ভিখারী নয়, এ যে ভগবান! ঈশ্বর। তাকে ছলনা করবার জন্য দেখা দিয়েছেন। বুড়ো সৈনিক তো অবাক।

ছদ্মবেশী ভিখারী বলে উঠলেন—'আমি তোমার উপর খুব খুশী হয়েছি। তুমি কি বর চাও বল, আমি দিচ্ছি।'

বুড়ো সৈনিক তখন বলল—'প্রভু, আপনি যদি আমার উপর খুশী হয়ে থাকেন, তবে আমায় একটি লাঠি দিন। সে লাঠি যেন আমার হুকুম মত চলে। আমি যাকে পেটাতে বলব তাকেই যেন সে পেটাতে থাকে।'

—'তথাস্তু! বেশ, তাই হবে।' ছদ্মবেশী ভিখারী বর দিলেন। বললেন:

'আর কিছু চাই?'

—'হ্যাঁ, প্রভু! আপনি যদি আমার প্রতি খুশী হন তবে আমায় একটি থলে দিন। এই থলেটির মুখ খুলে আমি যদি কোন লোককে বলি—এবার এর মধ্যে ঢোক, সে যেন সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ে তার মধ্যে।

—'তথাস্তু! বেশ, তাই হবে।' ছদ্মবেশী ভিখারী বলে উঠলেন:

'তোমার আর কিছু চাই তো বল। আমি বর দিচ্ছি। এমন কিছু চাও যাতে তুমি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করলে ঈশ্বর যেন তোমার সহায় হন।'

—'না, প্রভু! আমায় এমন একটি থলে দিন, যেটা উপুড় করলে টাকাকড়ি

মোহর যেন ঝরে পড়ে।'

—'তথাস্তু! তাই হবে।' এই বলে ছদ্মবেশী ভিখারী বিদায় নিলেন ওকে আশীর্বাদ করে।

বুড়ো সৈনিক তাই নিয়ে পথ ধরে চলল। চলতে চলতে সে এক শহরে এসে উপস্থিত হল। আর আশ্রয় নিলে এক সরাইখানায়। সরাইখানায় আরও অনেক গাঁয়ের লোক, শহরের লোক বসে খানাপিনা করছিল। বুড়ো সৈনিকও তাদের সঙ্গে টেবিলে বসে খানাপিনা করলে পেট ভরে। সরাইখানার মালিক এসে এবার দাম চাইলে খাবার-দাবারের। কিন্তু বুড়ো সৈনিক দাম দেয় কোত্থেকে? তার যে টাকাকড়ি কিছুই নেই।

বুড়ো সৈনিক তখন করলে কি, ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া তার সে থলেটা তুলে একবার উপুড় করলে। আর থলে থেকে অমনি ঝরে পড়তে লাগল টাকাকড়ি আর মোহর। বুড়ো সৈনিক সবটাই দিয়ে দিলে সরাইখানার মালিককে। বললে—'এই নাও। তোমার দাম তুমি চুকিয়ে নাও।

এই বলে সে বেরিয়ে পড়লে সরাইখানা থেকে। বুড়ো সৈনিক এগিয়ে চলল পথ ধরে। সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক বন। এই বনে ছিল এক কুড়ি চারজন ডাকাতের আস্তানা। ডাকাতদল নিরীহ পথচারীর কাছ থেকে ভাঁড়িয়ে সবকিছু কেড়ে-কুড়ে নেবার জন্যে বনের মাঝখানটায় এক সরাইখানা খুলে বসেছিল। বুড়ো সৈনিক হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এই সরাইখানায় এসে ঢুকল। আর কিছু খাবার চেয়ে খেল। সরাইখানার ডাকাতের দল এবার বুড়ো সৈনিকের কাছে খাবারের দাম চাইল। বুড়ো সৈনিক দাম দেয় কোত্থেকে? তার যে টাকাকড়ি কিছু নেই। এখন উপায়? তার তখন ঈশ্বরের দেয়া সেই থলেটির কথা মনে পড়ল। আর থলেটি উপুড় করতেই টাকাকড়ি, বিস্তর মোহর ঝরে পড়তে লাগল স্তূপাকার হয়ে।

ডাকাতের দল তাই দেখে তো অবাক। ওরা তখন করলে কি, বুড়ো সৈনিকটাকে সবাই মিলে টুকরো টুকরো করে কেটে রে ফেললে। আর বুড়ো সৈনিকের থলেটি নিয়ে সরে পড়ল।

মুড়ো

সুনীল ভট্টাচার্য

বাপির জন্যে হাসিখুশি
বুবুর জন্যে কান্না,
জানলা দিয়ে ডাকল পুষি
হলো কি মাছ রান্না?
বাজারে আজ মাছ ছিল না
ছিল মাছের মুড়ো

তাই শুনে বাজার গেলেন
রাম দাসের খুড়ো।
মাছও নেই মুড়োও নেই
আছে মাছের কাঁটা
মাছ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙ
পুষির কপালে ঝাঁটা।

জানোয়ারদের বিচার

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

তোমরা সবাই জান যে কোন লোক যদি অপর একজন লোককে বিনা কারণে খুন ক'রে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায়, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। আর সে প্রকৃত দোষী প্রমাণিত হলে, জজসাহেব তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর সব দেশেই এই নিয়ম মোটামুটি চালু আছে।

কিন্তু একথা কি জান, যে আগেকার দিনে যে-কোন অজ্ঞান পশুও যদি হঠাৎ কাউকে ক্ষেপে গি ে মেরে ফেলত, তাহলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত ?

তোমরা হয়ত ব, পশুদের কি মানুষদের মত অত জ্ঞান বুদ্ধি আছে, যে তারও বিচার ক'রে ত.. লতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রেওয়াজ ছিল ?

ইতিহাসের পুরোণো পাতায় কিন্তু তারও নজীর আছে—অবশ্য ভারতবর্ষে এরকম বিচারের প্রহসন হ'ত না। পশু ক্ষেপে গেলে তাকে হয়ত সরাসরি লোকে মেরে ফেলত, আদালতের হাতে কখনো সমর্পণ করত না। কিন্তু প্রমাণ রয়েছে যে, প্রাচীন ইউরোপের বহু দেশে কোন পশু কাউকে মেরে ফেললে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রথা ছিল এবং দোষ প্রমাণিত হলে তাকে ফাঁসী-কাঠে লট্‌কে দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত।

তিনশো বছর আগেকার কথা। একটি খচ্চর হঠাৎ তার প্রভুকে একদিন লাথি হাঁকড়ে পাঁচ হাত দূরে ছিট্‌কে ফেলে দেয়, আর ঐ ধাক্কায় সেই লোকটি মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আদালতে খচ্চরটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচারকরা আসামীকে

মৃত্যুদণ্ড দেন। এই রকম একটা ষাঁড় একটি গুঁতোয় একজনের দফা রফা ক'রে দেয়—ব্যস্ তারও ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়।

সেকালের আইনে এই বিধান ছিল কেন, তার সপক্ষে আইনজ্ঞরা বলতেন যে এই শাস্তি পেলে পশুরা বোধ হয় ভয়ের চোটে আর কাউকে মারবে না, সাবধান হয়ে যাবে। যেমনি উদ্ভট আইন, তেমনি বিচারকদের উদ্ভট বিচার।

তাঁদের যুক্তি ছিল, জানোয়ারদের বুদ্ধি যখন আছে, তখন নিশ্চয় তাদের ভালমন্দ বিচারেরও শক্তি আছে। অতএব অজ্ঞান অবোধ পশু ব'লে তাদের রেহাই দেওয়া যায় না। মানুষ আর পশুর মধ্যে তফাৎ নেই। অতএব মানুষ বা জানোয়ার কাউকে মেরে ফেললে, তাকে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এই বিবেচনা ক'রেই সেকালে এইরকম আইন চালু হয়েছিল।

এখন অবশ্য গৃহপালিত পশুর অপরাধে পশুর শাস্তি হয় না, হয় পশু-পালকের। কিন্তু সেকালে পালকদের কিছু হ'ত না, খোদ আসামীকে ধ'রেই বিচার চলত, পালকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেত না।

পশু আসামীর সপক্ষে ও বিপক্ষে উকিলরাও দাঁড়াতেন, তর্ক বিতর্ক সব কিছুই হ'ত, আর উকিলদের পয়সা দিয়ে অনেক সময় পালকরাই পরোক্ষে মামলা চালাতেন।

ফরাসীদেশে পাঁচ-ছ'শো বছর আগে ঘোড়া, ষঁ , কুকুর, মুরগী, শুয়োর এই রকম পশুদের বিরুদ্ধে শ'খানেক মামলা যে দায়ের করা হয়েছিল, তার নজীর আদালতের পুরোণো রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে।

১৩৯৪ সালে, গীর্জেতে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত একটি পবিত্র রুটি খেয়ে ফেলাতে একটি শূকরকে আদালত বিচার ক'রে ফাঁসির হুকুম দেন।

১৪৫৭ সালে ফ্রান্সেরই আর একটি গ্রামে, জন মার্টিন তাদের উঠোনে খেলা করছিল। মার্টিনের তখন বয়েস ছিল মাত্র পাঁচ বছর। ঐ উঠোনের এক কোণে ছিল একটি শুয়োরদের খোঁয়াড়। সেখানে থাকতো গুটি চার পাঁচ বাচ্ছা নিয়ে একটি শূকরী। শিশু মার্টিন খেলতে খেলতে সেই শূকরীর খোঁয়াড়ের কাছে যেই গেছে, অমনি শূকরী তেড়ে এসে তাকে মাটিতে ফেলে একেবারে দাঁত দিয়ে গলা চিরে দেয়। ছেলেটি মারা পড়ে।

তখন শূকরীকে পুলিশ তার কটি বাচ্চাসমেত গ্রেপ্তার ক'রে আদালতে

চালান দেয়। জজ বলেন—সাক্ষী প্রমাণ বিচার ক'রে আমি দেখছি যে ছেলেটির মৃত্যু ঘটিয়েছে আসামী শূকরী, কিন্তু শূকরীর বাচ্চাগুলো যে তাকে সেই সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, তার প্রমাণ ফরিয়াদীর উকিল আমাদের দেখাতে পারেন নি। অতএব সর্ত সাপেক্ষে আমি শূকরীকে ফাঁসি দিতে আদেশ দিলেও আসামীর বাচ্চাগুলিকে জামিনে আপাততঃ ছেড়ে দিচ্ছি। ওরাও যে মায়ের সঙ্গে এই কার্যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ পেলে পরে বিচার করব।

১৫৯৫ সালে ইংল্যাণ্ডের লিডেন শহরে প্রোভেটিক নামে একটি কুকুরকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়। কুকুরটি একটি রবিবারে জ্যান্‌জ্যাকব বলে একটি বাচ্চা ছেলের আঙ্গুল কামড়ে দেয় এবং সাতদিনের মধ্যে ছেলেটি মারা যায়। বিচারকরা প্রোভেটিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় রায় দেন যে, এই গর্হিত কাজের জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এবং তার এই কঠোর শাস্তি দেখে যেন অন্য কুকুররাও সাবধান হয়।

অনেক সময় আবার উচ্চ আদালতে আপীল ক'রে আসামীকে ছাড়িয়ে আনা বা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা বা একেবারে খালাস করিয়ে আনারও ব্যবস্থা ছিল এবং ছুঁদে উকিলরা সেরকম দু-চারটে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মক্কেলকে ছাড়িয়ে আনতেন তারও খবর ওয়া যায়।

আপীলে খালাস পেয়েছে, এমন পশুদেরও বিবরণ আদালতের পুরোণো নথি পত্রে রক্ষিত আছে। একটি শূকরী একটি গর্দভ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মুক্তি লাভ করে তাও লেখা আছে।

আবার জন্তুরা সময় সময় অনেক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে আসামীকে ধরিয়ে দিয়েছে এমনও প্রমাণ আছে। একবার ফরাসী দেশে মণ্ট্‌ডিডিয়ার ব'লে একটি লোককে একজন খুন ক'রে পালিয়ে যায়। লোকটিকে পুলিশ বহু অনুসন্ধান করেও ধরতে পারে না। মণ্ট্‌ডিডিয়ারের একটা কুকুর ছিল—খুনের সময় সে চেন দিয়ে বাঁধা ছিল ব'লে আততায়ীকে ধরতে পারে নি, শুধু চেঁচিয়েছে। তার ফাঁকে ম্যাকেরার ব'লে একটা লোক তাকে খুন ক'রে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সন্দেহ ক'রে অনেক লোককে ধরে কিন্তু সত্যি মণ্ট্‌ডিডিয়ারকে কে খুন করেছে তা বলতে পারে না। মণ্ট্‌ডিডিয়ারের বাড়ীর লোকেরা বলে যে, খুনের সময় তারা সেখানে হাজির ছিল না, তাই সঠিক বলতে পারে না, কে

তাকে খুন করেছে। একমাত্র সাক্ষী ছিল নিহত মণ্ট্‌ডিডিয়ারের একটি কুকুর, সে দেখেছে আততায়ীকে খুন করতে।

বিচারপতি বললেন—তাহলে কুকুরটাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এস। দেখা যাক্, সে এই ধৃত লোকদের মধ্যে সত্যিকারের অপরাধীদের চিনতে পারে কিনা।

কুকুরকে আনা হ'ল। সন্দেহ ক'রে যাদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে রেখে কুকুরটাকে যেই সেখানে এনে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, সে তখনি ক্ষেপে ম্যাকেয়ারের দিকে ছুটে গিয়ে তাকে আঁকড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে। কোনক্রমে তাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু সে এত ক্ষেপে উঠেছিল যে পুলিশও তাকে চেন দিয়ে ধরে রাখতে পারে না।

জজ তখন ম্যাকেয়ারকে বললেন—কি হে, সাক্ষী তোমায় ঠিক ধরেছে কি না? ভয়ে ভয়ে ম্যাকেয়ার স্বীকার ক'রে ফেললে সেই মণ্ট্‌ডিডিয়ারকে খুন করেছে। অতএব কুকুরের সাক্ষ্যে তার ফাঁসী হলো না কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

———

আড়ি

শুভেন্দু ঘোষ

নাইবা কথা বললে তুমি
বয়েই গেল ভারি
ভাবের মাঝে বড়ই মধুর
দুচার দিনের আড়ি,
নাইবা খেলা খেললে তুমি
খেলব আমি একা
মুখটি আমি ঘুরিয়ে নেব
হয় বদি বা দেখা

এমনতরো ঠিক ছিল সব
কিন্তু হলো একি!
মনের মধ্যে ইচ্ছে শুধু—
মুখটি তোমার দেখি,
নাইবা কথা বললে তুমি
আমিই কি আর পারি
এমন কষ্ট জানলে আগে
করতো কে আর আড়ি?

———

হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সন

অমলকুমার মিত্র

একশ বছরেরও আগেকার কথা।

ডেনমার্কের একটা ছোট্ট সহর, নাম ওডেন্‌সে।

এই ওডেন্‌সেতে বাস করতেন একজন মুচি, এণ্ডার্সন তাঁর নাম। আর বাস করতেন তাঁর স্ত্রী, আর ছোট্ট ছেলে হান্স।

পরিবারটি ছোট্ট হলে কি হবে, বড্ড গরীব। কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে তাদের দিন চলে যায়।

মুচির বড় ইচ্ছে ছিল—রাজকন্যাদের জন্য খুব সৌখিন, সুন্দর, নাচের জুতো বানান। এক ব সোনালী চামড়া দিয়ে বানিয়েও ফে'ল্লন এক জোড়া, কিন্তু কেউ তা কিনঃ না। কি করে কিনবে বল! ওডেন্‌সের এক গরীব অঞ্চলে ছোট্ট একটা বাসায় বাস করতেন ওঁরা; সে বাসায় মাত্র দু'টো ঘর। অমন গরীব পাড়ায় কি আর কোন রাজকন্যে আসেন? অমন ছোট্ট বাসায় কি আর কোন রাজকন্যে ঢোকেন?

কিন্তু তা বলে গরীব মুচি মন খারাপ করতেন না কখনও। মন খারাপ করে, চুপচাপ বসে থাকলেই বুঝি কষ্ট দূর হয়ে যায়?

সামনের ছোট্ট ঘরে থাকত মুচির সাজ-সরঞ্জাম। ছোট্ট একটা বেঞ্চ, কত জিনিসে সেটা ঠাসা। সব সুন্দর করে গোছান; ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আর সেই ঘরে ছিল ছোট্ট হান্সের ছোট্ট একটি বিছানা, তাতে ওর বাবার নিজের হাতের নানান কারুকার্য করা। খেয়ালে খেয়ালে সুন্দর সুন্দর সব ছবি, আর ছোট্ট একটা বইএর তাক এক কোণে। তাতে মুচির অনেক বই, বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া।

রান্না ঘরটিও বড় পরিপাটি করে সাজান। তাকে তাকে চকচকে ঝকঝকে বাসন-কোসন। পরিমাণে খুব বেশী নেই ঠিকই—কিন্তু যে কটি আছে, তা বেশ উজ্জ্বল, ঝলমলে।

বাড়ীটার ওপরে ছোট্ট একটা ছাদ। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটা মৈ উঠে গেছে সেই ছাদে। ছোট্ট হ্যান্স সেই মৈ দিয়ে তর তর করে উঠে যায় ছাদের ওপরে। ওখানে ওর স্বপ্ন রাজ্য—ওর মার নিজের হাতে তৈরী করা সুন্দর একটা বাগান। গরীব মুচির ছোট্ট বাড়ীতে কোন উঠোন ছিল না, ছিল না বাগান করার মতন কোন জমি। কিন্তু তা বলে হ্যান্সের মা দমেন নি মোটেই। বালতি বালতি মাটি নিয়ে ছাদের ওপরে যে সব কাঠের বাক্স ছিল, সেগুলিকে ভরাট করে, সেই বাক্সের মধ্যেই নানা রকমের রং-বেরংএর ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। আর সে সঙ্গে রকম বেরকমের কিছু শাক সব্জির গাছও। সব মিলিয়ে বড় ছিমছাম, বড় পরিপাটি, বড় সুন্দর হয়েছিল দেখতে।

সারাদিন হ্যান্সের বাবা ঠুকঠাক, ঠুকঠাক করে হাতুড়ি পেটাতেন, পেরেক ঠুকতেন, জুতো সেলাই করতেন। তারপর সূয্যি ডোবার সাথে সাথে ওঁর কাজও ফুরোত, হ্যান্সেরও শুরু হত দিনের সবচেয়ে মজার সময়। বেঞ্চের ওপর থেকে চামড়ার সব টুকরো সরিয়ে ফেলা হত, সরিয়ে ফেলা হত সব জুতো, সব ছুঁচ, সব যন্ত্রপাতি। বেঞ্চটাকে একদম পরিষ্কার ক নিয়ে তারপর তার ওপর শুরু হত এক মজার খেলা—খেলনা তৈরী করার খেলা। হ্যান্সের বাবা মজার মজার সব খেলনা বানাতে আরম্ভ করতেন ছোট্ট হ্যান্সের জন্য। পুরোণ একটা বাক্সকে কেটে খেলনার একটা 'পুতুল থিয়েটার' ছেলেকে বানিয়ে দিলেন ওর বাবা। বাক্সটার গায়ে কাপড়ের পর্দা—হাওয়ায় কেবলই দোলে, দোলে, দোলে। মোমের আলোয় কাগজের পুতুলগুলো যেন কথা বলে, টিনের পুতুল-গুলো যেন যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী, চামড়ার পুতুলগুলোর মুখেও আলো-ছায়ার খেলা। হ্যান্সের বাবা পুতুলের পর পুতুল বানান, আর ছেলেকে গল্প বলেন। খেলনার থিয়েটারে কেবল পুতুল থাকলেই তো আর চলে না—নানান রকম দৃশ্যের প্রয়োজন। ছোট্ট ছোট্ট তুলির টানে মনোরম সব দৃশ্যও আঁকা হয়ে যায় চোখের পলকে। হ্যান্সের বাবার আবার একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসও ছিল, আর একটা ছোট্ট টিনের বাক্স। রোববারে রোববারে বাপ ব্যাটায় চলে যেতেন

সহরের বাইরে—নদীর তীরে তীরে, গ্রামের পথে পথে। কুড়িয়ে আনতেন সেই টিনের বাক্সে করে রকমারি সব ফুল।

আঃ! সে কি আনন্দ—রোববারের আনন্দ! বাবার হাত ধরে রাঙা মাটির পথ বেয়ে হ্যান্স বেরিয়ে পড়ত, যেদিকে দু' চোখ যায়—সেদিকে। সহরের পথে কোন ঘাস ছিল না, কেবল নুড়ি আর নুড়ি। আর সেই নুড়ির ওপরে হাজার পায়ের ভিড়, রোববারের ভিড়। কত রকম লোকেরই না আনাগোনা হত—মিস্ত্রী, তাঁতি, দর্জি, দোকানের কর্মচারী। কিন্তু সহরের যেখানে শেষ, গ্রামের সেখানে শুরু। সহর আর গ্রামের মাঝে ছোট্ট একটা নদী—নদীর ওপরে সুন্দর একটা সেতু। এখানে ফুল, ওখানে ফুল। গাছে গাছে হাজার পাখীর কাকলি। আর গরমের বিকেলে জলের কিনারে কিনারে লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা সাদা সাদা সারস আর বক। গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেও বাবাতে ছেলেতে কত গল্প। গল্প আর গল্প—আরও গল্প, আর ফুল কুড়োন, কুড়োন। ফুল দিয়ে মালা গাঁথা। সে মালা এনে মার হাতে তুলে দেওয়া।

দেখতে দেখতে সৌখিন সেই পুতুল নাচের থিয়েটারটা আশে পাশের অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল, অনেক বাচ্চা এসে 'শো' দেখে যেত। হ্যান্স এবং তার বাবার আ র আর ধরে না। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের অনুকরণে আরও সুন্দ সুন্দর খেলনার বাড়ী ঘর, রাজপ্রাসাদ, গির্জা, দুর্গ, সিন্-সিনারি তৈরী করতে আরম্ভ করে দিলেন। নিজেদের হাতে বানাতে লাগলেন রকমারী সব পুতুল। সব এক একটা রূপকথার মডেল। কেউ বা রাজকুমার, কেউ বা রাজকন্যে, কেউ বা পক্ষীরাজ ঘোড়া, কেউ বা ব্যঙ্গমা-বেঙ্গমী। আবার দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্কস বানাতেও ভুল করলেন না তাঁরা। রূপকথার সব ক'টি ছবি একেই যদি রূপ দেওয়া না গেল—তাহলে সৌখিন থিয়েটারটা যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আবার কেবল পুতুল বানালেই চলে না, সাজিয়ে দিতে হয় তাদের রকমারী সব পোষাকে। নাগরাই জুতো আর জরির শাড়ী, চুড়িদার পায়জামা আর সৌখিন টুপি, মজাদার আলখাল্লা আর রেশমী ওড়না—বিচিত্র রঙের ও ঢঙের কত অসংখ্য পোষাকই না তাদের লাগে! অথচ গরীব মুচির না আছে টাকাকড়ি, না আছে জমিজমা। সম্বল কেবল ছোট ছোট, ফেলে দেওয়া কতকগুলো চামড়ার টুকরো। আর

এখান থেকে, ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কাপড়। তাই সই—তাতেই চলবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কাজ হয় নাকি কিছু? মন যদি খুশি থাকে, আর হাতে যদি থাকে হাতিয়ার—তাহলেই রূপকথার কল্পনা লোককে নিয়ে আসা যায় কুঁড়ে ঘরের আশে পাশে।

বসন্তের এক সকালে হ্যান্সি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেঘের খেলা দেখছে। এমন সময় বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা ওদের ছোট্ট গলিটার ভেতরে ঢুকে পড়ল, বাজনা বাজাতে বাজাতে। সহরের শ্রমিকরা প্রতি বছরই বসন্তকালে এই ধরণের শোভাযাত্রা বের করত। শোভাযাত্রার সামনে থাকত একজন সং। গলায় তার ঘুঙুরের মালা। পেছনে পেছনে একদল তাঁতী। তারপর আসত রুটি ওয়ালারা, রাখাল বালকেরা, রাজমিস্ত্রীরা এবং সবার শেষে মোমবাতি প্রস্তুতকারকেরা। এমন কি কসাইখানার কসাইও বাদ যেত না—মস্ত বড় একটা ষাঁড়কে তাড়াতে তাড়াতে সেও এসে যোগ দিত এই শোভাযাত্রায়। ষাঁড়ের শিং-এ ফুলের মালা—বাতাসের দোলায় দুলত দোদুল দোলায়। ওডেন্‌সের পথে পথে এই শোভাযাত্রার পথ পরিক্রমা; রাস্তার আশেপাশে বাড়ীর ছাদে ছাদে দর্শকের ভিড়। হ্যান্সও এর পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল। কাদার মধ্যে ওর একটা কাঠের জুতো গেল হারিয়ে। তা হারাক, তাতে হয়েছে কি? মাথার ম য্যে ওর একটা মতলব খেলে গেল এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তার মতলবটাকে সে কাজে লাগিয়ে দিল।

এই শোভাযাত্রার কয়েক দিন পরের ঘটনা।

ওডেন্‌সের তাঁতের কলগুলোতে ঠক-ঠক্কাস, ঠক-ঠক্কাস কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। তাঁতীরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ তাঁতের আওয়াজ ছাপিয়ে মিষ্টি মধুর সুরে ভেসে এল কচি কণ্ঠের সুরেলা গান। গ্রাম্য গান, গ্রাম্য সুরে গাওয়া যেমন-মিষ্টি, তেমন সুন্দর। সর্দার তাঁতী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ভাবলেন—দেখি তো কে এমন মিষ্টি সুরে গাইছে। মাথা তুলে দেখেন, তাঁতগুলোর মধ্য দিয়ে বালক হ্যান্স গান গাইতে গাইতে আসছে। ওর গানের তালে তালে তাঁতীদের তাঁত চল্ল আরও দ্রুত লয়ে। কারখানায় ঢোকার আগে কতই না ভয় ছিল বেচারা হ্যান্সের। কিন্তু যে মুহূর্তে কারখানার ভেতরে ঢুকে পাখীর মতন গান গাইতে শুরু করে দিল সে, মন্ত্র বলে

সব ভয় কোথায় হারিয়ে গেল।

পুতুল নাচের পুতুলগুলোর জন্য চকচকে, ঝকঝকে, নতুন কিছু কাপড়ের টুকরো না হলেই চলছিল না। আর সে জন্যেই তাঁতকলে গিয়ে গান গাওয়ার এই মৎলব এল তাঁর মাথায়। আর তাঁতীরাও দারুণ খুশি হয়ে হ্যান্সকে প্রচুর কাপড়ের টুকরো দিয়ে তাকে একদম বোঝাই করে ছাড়ল। হ্যান্স ফিরে এল বাসায়। তারপর যখনই কাপড়ের প্রয়োজন হত, তখনই সে সুমিষ্ট গান গেয়ে তাঁতীদের ভুলিয়ে মনের সুখে কাপড় বোঝাই হয়ে ঘরে ফিরত। অচিরেই হ্যান্সের পুতুলগুলো দেশের সেরা পুতুলের মর্যাদা লাভে ধন্য হল ; একমাত্র কোপেন হেগেনের পুতুল ছাড়া মফঃস্বলের আর কোন পুতুল হ্যান্সের সাথে পাল্লায় পেরে উঠল না। হ্যান্সের ছোট্ট থিয়েটারটারও নাম ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চারা ভিড় করে দলে দলে আসত, পুতুল নাচ দেখত, আর হাততালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরে যেত।

হ্যান্সও আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল—গলাও খুব মিষ্টি হল ওর। গান গেয়েও দু' পয়সা পেতে আরম্ভ করল হ্যান্স। পুতুল নাচের জন্য নাটক লিখতে লাগল ; নাটক লিখতে লাগল আসল থিয়েটারের জন্য। যখন তেরটি ডলার জমল, হ্যান্স ঠিক করল কোপেনহেগেনে যাবে, গিয়ে ওখানে অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করবে। তখনও ওর বয়স খুব কম। তা হোক—গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ । দুঃখী মা বাবার দুঃখ ঘোচাতে হবে, ওঁদের শেষ জীবনটাকে একটু স্বচ্ছল করে তুলতে হবে। পুতুলগুলোকে সব বেঁধে ফেল্ল হ্যান্স, কাপড়গুলোকে সাজিয়ে নিল পরিপাটি করে। তারপরে নানা রঙের ওডেন্সেকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চল্ল হ্যান্স রাজধানীর দিকে। পেছনে রইল পড়ে ছায়া ঢাকা গ্রাম, পুরণো বন্ধুবান্ধব, ঝিরঝিরে নদী, আর লম্বা ঠ্যাঙ-ওয়ালা সব সারস ও বক।

কিছুদিনের মধ্যেই কোপেনহেগেনের এক নতুন কবি ও নাট্যকারের নাম ছড়িয়ে পড়ল ডেনমার্কের ঘরে ঘরে। নতুন এই স্রষ্টার নাম হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সন। ওঁর নাটক মানুষের ঘরে ঘরে, ওঁর কবিতা লোকের মুখে মুখে। আর ওঁর গল্প বলার কায়দা ?

অমনটি বুঝি আর হয় না! নাওয়া-খাওয়া ভুলে ওঁর গল্প শুনতে হয়। গল্প শুনতে শুনতে জগৎ সংসার সব কোথায় হারিয়ে যায়। রাজা

মহারাজারা ওঁর গল্প শুনে তাজ্জব, বড় বড় শিল্পীরা ওঁর গল্প শুনে মুগ্ধ! ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার রাণী, গ্রীসের সম্রাট, ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স, গায়িকা জেনি লিণ্ড—কাকে ফেলে কার নাম করব! আর ওঁরা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সনের কোন্ কোন্ গল্প ভালবাসতেন জান? ভালবাসতেন—"দি ফার ট্রি", "দি স্নো কুইন", "দি লিটিল্ ম্যাচ গার্ল", "দি রেড সুস", এবং "দি স্টেডফাষ্ট টিন সোলজার"—এইসব গল্পকে।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সনের নাম ডেনমার্ক ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের ঘরে ঘরে। অথচ বিখ্যাত এই মানুষটি সব সময় ওঁর পকেটে একটা 'টিন সোলজার' নিয়ে ঘুরতেন। বাচ্চা একটা ছেলে ওঁকে এই জিনিষটা উপহার দিয়েছিল একদিন। সব সময় ওটাকে কাছে কাছে রাখতেন হ্যান্স এণ্ডার্সন। উনি যে কত বড় হয়ে গেছেন, তা কিন্তু তিনি কখনও বুঝতেন না। অথচ কোন রাজসভায় ঢুকে একবার যখন তিনি "অনেক, অ-নে-ক দিন আগে" শুরু করতেন—সব যেন মন্ত্র শান্ত হয়ে যেত। রাজা মহারাজারা ভুলে যেতেন তাঁদের সব সমস্যা ও বিপদের কথা; মন থেকে দূর হয়ে যেত সব দুশ্চিন্তা। কেবল চোখের সামনে ভেসে উঠত মাঠের পর মাঠ, ঝির ঝিরে নদী, রং বেরঙের মেঠো ফুল আর লম্বা লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা সারস ও বক। হাজার হাজার শিশু এসে ঘিরে বসত তাঁকে—গল্প শোনার আশায়। আর গল্প বলতে বলতে কাঁচি ছুরি দিয়ে কাগজ কেটে কেটে গল্পের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতেন হ্যান্স—শিশুদের চোখের সামনে। দেখতে না দেখতে রূপকথার পরীরা ডানা মেলে নেমে আসত আকাশ থেকে; চোখের পলকে গজে উঠত কাগজের রাখাল, মাঠ ভরা ফুল, গভীর বন, মেঠো প্রান্তর। ওঁর নাম এত ছড়িয়ে পড়ল যে ছোটবেলার ওডেন্‌সে থেকে ডাক এল একদিন—"হ্যান্স, ফিরে এসো তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া সহরে। তোমাকে আমরা ভালবাসি, সম্বর্ধনা দেব তোমায়!"

হ্যান্স ওডেন্‌সেতে খুব সুন্দর একটা বাড়ী কিনলেন। সেই বাড়ীতে ওঁর বুড়ো বাবা আর বুড়ী মা বাস করতে লাগলেন পরম সুখে। কিন্তু হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সনের মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না। গল্প বলতে পারলে আর কিছু চাইতেন না তিনি, কিন্তু লোকে যখন এই গল্প বলা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করত, বিরক্ত হতেন হ্যান্স। কথিত আছে—ওডেন্‌সেতে যেদিন তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা,

সেদিন অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হ্যান্স কিছুতেই সম্বর্ধনা সভায় যেতে চাইছিলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছে করছিল—চুপচাপ করে ঘরে শুয়ে থাকেন, জানালা দিয়ে মেঘের খেলা দেখেন। কিন্তু লোকে যাঁকে ভালবাসে তাঁর কি শান্তিতে থাকা চলে? যখন দেখলেন ওঁকে নেওয়ার জন্য সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে হাজির—তখন কি আর করা, ঐ দাঁত ব্যথা নিয়েই হ্যান্সকে উঠতে হল গাড়ীতে।

কিন্তু সভায় গিয়ে যখন দেখলেন—চারদিকে মালা আর মালা, হাজার হাজার শিশুর হাসি আর গান, মশালবাহী শোভাযাত্রা আর পতাকা মিছিল, মিষ্টি মিষ্টি বাজনা আর সুন্দর সুন্দর নাচ—তখন সব ব্যথা ভুলে তিনিও আনন্দে মেতে উঠলেন; হ্যান্সের জীবনে এর চেয়ে শুভদিন যে আর কখনো আসে নি।

হ্যান্স এণ্ডার্সনের নাম আজ বিশ্বের ঘরে ঘরে। মনে হয় না পৃথিবীতে এমন কোন শিশু আছে যে তাঁর গল্প পড়ে নি বা তাঁর গল্প শোনে নি। গল্পের এই যাদুকরটির রূপকথার গল্প বিশ্বের সব ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এণ্ডার্সনের রূপকথা শিশুদের হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, মাতায়। পৃথিবীর সব শিশু তাঁর কাছে চির ঋণী, কারণ তাঁরই জন্য শিশুদের জগৎ এত রূপ রস বর্ণে গন্ধে ভরা; তাঁরই জন্য নীল আকাশটাকে আরও বেশী নীল বলে বোধ হয়, রামধনুকে মনে হয় আরও রঙীন

[হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সন—কবি এবং গল্প লেখক। রূপকথার যাদুকর। জন্ম ডেনমার্কের ওডেন্‌সেতে—১৮০৫ সালে। গরীব এক মুচির সন্তান। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই ওঁর লেখা একটা গল্পের বই প্রকাশিত হয়। তারপর ডেনমার্কের সম্রাট ফ্রেডারিক ওঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন—১৮২২-১৮২৭। অসংখ্য নাটক ও উপন্যাসের রচয়িতা, তবে ওঁর রূপকথাই ওঁকে আজও অমর করে রেখেছে। মৃত্যু: ১৮৭৫।]

চরকা বুড়ী গুড়ি গুড়ি
হাঁটে লাঠি নিয়ে।

কেউ জানে না কোন জন্মে কার সাথে তার হয়েছিল বিয়ে!

অথচ তার বিয়ের গল্পে বুড়ী পঞ্চমুখ!

একশো জন লাঠিয়াল নিয়ে বর এলো তাকে বিয়ে করতে। তাদের হাতে লাঠি, মাথায় ঝাকড়া চুল।

গাঁয়ের মোড়ল ছিল বুড়ীর বাবা। সকলে একজোটে বলল—এত লাঠিয়াল নিয়ে বিয়ে করতে আসা মানে মোড়লকে ভয় দেখানো। এ মোড়লের অপমান। গাঁয়েরও একটা নিন্দে। কেন, আমরা কি বেঁচে নেই? আমাদের ঘরেও কি লাঠি নেই?

কি করা যায়? অমনি খবর চলে গেল মুখে মুখে। দেখতে না দেখতে জড়ো হ'য়ে গেল দু'শো লাঠিয়াল! তাদের মাথায় লাল গামছা। গোঁফে চাড়া দিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল তারা।

বিয়ে বাড়ী খুব হৈ চৈ। খাওয়া দাওয়া, বাজি-বাজনা। পথ চলতি ভিন গাঁয়ের একটি লোক জিজ্ঞাসা করল ব্যাপারটা কি, এত লাঠিয়াল কেন?

উত্তর হ'ল—মোড়ল মশায়ের বাড়ী বিয়ে।

—বিয়ে হচ্ছে কার সাথে?

কে একজন উত্তর করল—মোড়ল মশায়ের মেয়ের সাথে।

বরের বাবা কথাটা শুনে মহা খাপ্পা। বলে—কভি নেহি। বিয়ে হ'চ্ছে আমার ছেলের সাথে।

মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে হ'চ্ছে, না ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে—প্রশ্নটা দাঁড়াল এই।

ঝাঁকড়া-চুল পালোয়ানরা বলে,—ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে।

মাথায় লাল-গামছা লাঠিয়ালরা বলে—কক্ষনো না, মেয়ের সাথেই ছেলের বিয়ে হ'চ্ছে।

মহা হট্টগোল। মন্তর পড়তে পড়তে পুরুত ঠাকুর থেমে গেলেন।

বরপক্ষের দাবী—আগে বিচার হোক্ কার সাথে কার বিয়ে হ'চ্ছে, তারপর বিয়ে।

ডাক পড়ল বড় বড় মাথাওয়ালা লোকের। তাঁরা দুপুর রাত অবধি শাস্ত্র ঘেটে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বললেন—দু'জনেরই দু'জনের সাথে বিয়ে হচ্ছে।

কিন্তু বরের বাবা তাতে খুশী নয়। এ হতেই পারে না। মেয়েছেলে কি বেটাছেলেকে বিয়ে করতে পারে নাকি? পুরুষের উপর দিয়ে যাবে মেয়ে? তারপর হুংকার দিয়ে বলল—আমার ছেলে যদি বাপ্‌কা বেটা হয়, তাহলে এখনই···

বরপক্ষের একশো লাঠিয়াল অমনি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় লাল-গামছা বাঁধা দু'শো লাঠিয়াল গর্জে উঠল—এখনই কি?

বরপক্ষের পালোয়ানরা বলে—বিয়ের আসর থেকে জোর করে নিয়ে যাবো মেয়েকে—

গাঁয়ের লাঠিয়ালরা বলে—ঝাঁকড়া-চুলো মাথাগুলো সব রেখে দেবো এখানে।

আর যায় কোথায়! বেঁধে গেল দাঙ্গা।

লাঠিতে লাঠিতে খটাখট্, সোরগোল, কান্নাকাটি, চিৎকার। কুটুম্বরা ছাতি ফেলে পালাল, নিমন্ত্রিতেরা খালি পেটে পালাল, রান্নার লোক উনন ফেলে পালাল। এদিকে শানাইওয়ালা তার শানাই ফেলে পালাল, ঢাকওয়ালা ঢাক ফেলে পালাল, পুরুত গামছা ফেলে পালাল, এয়োরা বরণডালা ফেলে পালাল।

ভোর হ'য়ে গেল। গাঁয়ের আর আর পাঁচজনের চেষ্টায় দাঙ্গা থামলে, যে যে পালিয়েছিল সবাই ফিরে এলো, এলো না কেবল বর আর কনে। খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ। কোথায়ও তাদের হদিশ মিলল না। একেবারে বেপাত্তা।

বরের বাবা মেয়ের বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে—বেয়াই, তোমার মেয়ের সাথেই আমার ছেলে গেছে কোথায় চ'লে।

মেয়ের বাবা ছেলের বাবার গলা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে—বিয়াই গো, তোমার ছেলের সাথেই আমার মেয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে! কার সাথে কে গেল ঠিক হ'ল না কিছু।

এই হ'চ্ছে চরকা বুড়ীর বিয়ের ইতিহাস। বুড়ী যেন একটা গল্পের থলে। চরকা কাটে আর গল্প বলে। ছেলে মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরে। তারা একমনে গল্প শোনে আর বুড়ীর তূলোর বীজ ছাড়ায়।

রাত্রে বুড়ীর ভালো ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে বুড়ী তার গল্পের মুসাবিদা করে রাখে: এক গাঁয়ে ছিল তিন ভাই চোর। তারা সবাই নিজেকে সব চাইতে বড় চালাক বলে মনে করে। এই নিয়ে তাদের ঝগড়া। তারা গেল তাদের গুরুর কাছে—বিচার করে বল, আমাদের কে বড় চালাক।

গুরু তার সাগরেদদের বলল—কাজ না দেখে কি বলা যায়? তোমরা বেরিয়ে পড়। তারপর কে কি বাগালে আমাকে এনে দাও, কেমন করে বাগালে আমাকে বল, তবেই ত বিচার।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। কত দূর গিয়ে এক মাঠের মধ্যে তারা দেখে, গাধার পিঠে চড়ে একটি লোক যাচ্ছে। তার সঙ্গে আছে একটি রাম ছাগল, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ছাগলের দড়ি গাধার লেজের সঙ্গে বাঁধা দেওয়া। ছাগলটি গাধার পিছন পিছন হাঁটছে আর ঠুন্ ঠুন্ করে বাজছে তার গলার ঘণ্টা।

প্রথম চোর বলল—আমি ওর ছাগলটাকে চুরি করব।

দ্বিতীয় চোর বলল,—আমি ওর গাধাটাকে নিয়ে হাওয়া দেবো।

তৃতীয় চোর বলল—আমি ওর পরণের কাপড়খানি লোপাট ক'রে দেবো।

এদিকে এক চোর বুড়ীর ঘরে চুরি করতে এসে এক মনে তার গল্প শোনে। তারপর কি হ'ল জানবার জন্য চুরি করার কথা সে ভুলেই যায়। এদিকে রাত ফর্সা হ'য়ে আসে।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে।

পঞ্চুর কাছ থেকে ছাগলটা পাওয়ার পর থেকে টেনিদার মন ভারি খুশী হয়ে উঠেছিল। এতো এত চেষ্টার পর আবার হারানো মাণিক ফিরে পাওয়া গেল। আনন্দে ডিলা গ্রাণ্ডিম্যাফিষ্টেফিলিস—ইয়াক্ বলে চিৎকার করতে গিয়েই সে থেমে গেল। যদি ভুরকুটানন্দ টের পেয়ে যায়। ছাগলটি যে পঞ্চু নিয়ে এসেছে এটা তো সে নিশ্চয়ই বুঝেছে, সুতরাং এখন সারা পৃথিবী ঘুরে সে খোঁজ করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অতএব এখন আর আনন্দ নয়। ছাগলটাকে এখন দেখা দরকার হয়তো বা মরেই যাবে। যেমন নেতিয়ে পড়েছে সে। পটলাকে কিছু খাবার আনতে পাঠিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে—পঞ্চে, তুই বরং সদর দরজায় থাক, কেউ এলেই আমাকে খবর দিবি। যেমন দুষ্টু লোক ভুরকুটানন্দ ও পৃথিবী তোলপাড় করেও ছাগলটাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে। খুব সাবধান!

এতক্ষণ কুট্টিপিসির ঘরে আলো জ্বলছিল। তিনি যেন কী করছিলেন। এখন তাঁর গলায় বেসুরো গান শোনা গেল। কুট্টিপিসি ঘুমোবার আগে গান করে—'না জেনে দিয়েছি সাঁতার' হে গঙ্গাধর—ধর।' ধীরে ধীরে ঘুমে তারও

গলা জড়িয়ে এলো। হাতের পাখা ধপাস করে খসে পড়লো মেজেতে। সে শব্দও শোনা গেল।

টেনিদা ধীরে ধীরে উঠলো।

ছাগলটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ভুরকুটানন্দ কত টাকা যেন লুটে পুটে খেয়েছে এই ছাগলটার দৌলতে, নইলে ওর এই হাল কখনও হয়?

বাইরের অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো। পটলা ছুটে খাবার নিয়ে এলো। আপেল, রুটি, মাখন, আরো কত কি! কিন্তু মুখের কাছে হাজার বার ধরে দেওয়াতেও সে আর খেলে না।

মুখ তুলেই চাইলো না।

টেনিদা তাকে অনেক সাধাসাধি করলো; কিন্তু সে যেমন শুয়েছিল ঠিক তেমনি করেই শুয়ে রইলো।

রাতের বাতাস ঘন হয়ে এলো। দরজায় বসে থাকা পঞ্চু কি ঘুমিয়ে পড়লো, দেখতো একবার! টেনিদা বললে—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই।

সে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। আর হবেই বা না কেন? সারাদিনের খাটুনি। ছুটোছুটি তো সে কম করে নি। টেনিদা দেখলে, কুরকুর করে পঞ্চুর নাক ডাকছে।

যাক্‌গে ও ঘুমোক। খেটেছেও তো কম নয়। একটু মায়াও হলো টেনিদার। ঘুমন্ত লোকটাকে আর বিরক্ত করে দরকার নেই।

পটলাও যেন কেমন উসখুস করছে।

—আমাকে আর কোন দরকার আছে?

—কেন বল তো?

—আছে নাকি, বল না?

—তোর শরীর খারাপ লাগছে?

—না, তা ঠিক নয়? পটলা লজ্জা পেল।

—তবে কী?

—মানে, একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো পটলা।

—তুই কি ঘুমোতে যেতে চাস?

—যদি কাজ থাকে তবে নয়। পটলা বললে।

—কাজ মানে ছাগলটা তো কিছুই খেল না। ঠিক তেমনি নেতিয়ে পড়ে রইলো। কি করা যায় বল তো?

—কি আর করবে বল?

—কি আর করবে? যদি মরে যায় তবে তো সবই গেল। তবে তার চেয়ে একটু চেষ্টা করে ওর কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়।

—ছিঃ—ছিঃ, টেনিদা বললে—এটা তুই কি বলছিস্? টেনিদার গণ্ডারের খাঁড়ার মত নাক দিয়ে একটা ঘোঁৎ করে আওয়াজ বেরোলো। আর বাজখাঁই গলায় একটা ঘর কাঁপান আওয়াজ তুলতেই যেন ছাগলটা একবার তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলো।

—তোমার বাজখাঁই গলার আওয়াজে ওটাও চমকে উঠেছে। ওটার কিছু-ই হয় নি। ভুরকুটানন্দের শিক্ষা ওটা কি মরে যায়। ও শুধু ভাণ করে আছে অমনি করে, আসলে কিছুই হয় নি।

তবে ডিলা-গ্রাণ্ডি—ম্যাফেলিসষ্টেফিলিস—ইয়াক—ইয়াক বলা উচিত বল?—

—না এখনও নয়। হয় তো চ্যাং বা ভুরকুটানন্দ কোথাও লুকিয়ে আছে। আমাদের আনন্দ করবার সময় এখনও নয়।

—কিন্তু আমায় একটু ছাড়তে হবে টেনিদা।—পটলা বললে।

কেন র‍্যা—টেনিদা একটু খুশী হয়ে জবাব দিলে।

—কেন? আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।

—তোকে ঘুমেই খেলে।—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে।

—একটু থাক না। কোন দরকার তো হতে পারে।

—আমি একটু ঘুমিয়ে নি। আমার ঘুমের এক ঘণ্টা পর তুমি আমায় জানিয়ে দিও। তারপর আমি পাহারা দেব তুমি ঘুমিও।

টেনিদা চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ।

—কিছু বলছো না যে?—পটলা বললে।

—কী বলবো?—বিরক্ত হলো সে।

—কি বলবে। আমি ঠিক এক ঘণ্টা পরই আসবো।

—আচ্ছা যাও। কিন্তু যেন মনে থাকে।

রাত গভীর হয়ে এলো।

চারদিক নিশুতি। দূরে দূরে জোনাকির আলো দেখা যাচ্ছে। গভীর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগলো।

টেনিদার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

হয়তো ভুরকুটানন্দ ওকে তালিম দিয়ে অনেক দুষ্টুমি বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে। ওর কিছুই হয় নি। একটু লোভও হলো মনে মনে। যদি আমি কিছু সোনা পাই মন্দ কি। এখন সবাই তো ঘুমিয়ে।—যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তবে বেশ করে একদিন গ্রাণ্ড ফিষ্টি করা যাবে।

সুতরাং টেনিদা সব ভুলে গিয়ে ওর মুখ দিয়ে সোনা বের করবার কাজে লেগে গেল।

হঠাৎ দূরের অন্ধকার আকাশ ভেদ করে প্রবল একটা গর্জন শোনা গেল।

দড়াম করে বন্ধ জানালা খুলে গেল।

আর আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো সেই ভগমান। পায়ে খড়ম, গায়ে চাদর, রাগে তাঁর গোল গোল চোখ দু'টো লাট্টুর মত বন বন করে ঘুরতে লাগলো।

তোরও লোভ। কি বলেছিলাম রে তোকে। লোভ করিস নি—যায় কে, কেষ্টর জীব চলে আয়—হাত দিয়ে তিনি ছাগলটাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

ছাগলটা এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। তারপর খোলা জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে কেমন গলে গিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে ভগবানের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

যাবার সময় টেনিদাকে স্যালুট করে বললে: —টা—টা—

টেনিদার খড়গের মত নাক দিয়ে একটা প্রবল গর্জন ওঠবার আগেই তারা দূরে—আরো দূরে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টেনিদার অবাক—হাঁ করা মুখে এক ঝাঁক মশা এসে ছুটে ঢুকে পড়লো।

—থু—থু! টেনিদা নিদারুণ অবস্থা আরো মর্মান্তিক করে দিতে গায়ের ওপর কর-কর করে গোটাকতক আরশোলা উড়ে পড়লো।

পটলা, ও পটলা—বাঁচা, সেভ মি! কান্নাভরা গলায় টেনিদা চিৎকার করতে লাগলো।

সমাপ্ত

মোটর চালাই

ধীরেন বল

ভটর্-ভটর্ ছাখ না মোটর চালাই যে,
চুপটি বসে চুষছি কষে মালাই যে!
তোমরা আবার ভিড় করেছো রাস্তাতে,
যোগ দিয়েছে ছাগল-ভেড়া-হাঁস তাতে।
এমন ধারা করলে পথে গপ্পো রে
কড়ে টিকি লটকে নেবো খপ্ করে।
টিকি আবার চাকার সাথে প্যাঁচ খাবে,
ল্যাজের মতো পেছনটাতে ছ্যাঁচড়াবে!
একশো চুয়াল্লিশ ধারা কি জানো না?
জংলী কিনা,—আইন-কানুন মানো না!

ভ্যাক্—ভ্যাক্—ভ্যাক্ এই ছাখো না! কালা কি?
যায় না কানে? শুনতে পাও না? চালাকি?
বাঁশ বাঁধা আর তার জড়ানো পাঁজরা যে,
দম ফুরিয়ে তাও ত হলো ঝাঝ্রা যে!
শেষ কালেতে চাপবো ঘাড়ে ধাঁ করে,
হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছো হাঁ করে!

গুটিয়ে কাছা ভাগ না ওরে আহ্লাদী,
মুরোদ থাকে আয় না ছুটের পাল্লা দি।

ভাঙা গিয়ার, ষ্টিয়ার কি আর টিক্‌বে গো ?
তেমন-তেমন বুঝলে কিন্তু ঠিক ভেগো !
ফাইট করে লাইট দু'টোর কাঁচ ভাঙা,
হুমড়ি খাবে খানায় কখন্ মাছরাঙা !
প্রাণের কেয়ার সওয়ার করি থোড়াই ত,
মরতে হলে মরবো জানি মোরাই ত !
আজে-বাজে লাভ কি বকে ? পথ ছাড়ো !
তোদের কাছে হার মেনে যায় নচ্ছারো !!

———

টুকরো হাসি

ত্রিলোচন মুন্সী

কোনো এক ডাক্তারখানায় জনৈক রোগী এসে বললে—ডাক্তারবাবু, আজ আমি শরীরে মনে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছি, একটু দেখুন তো আমায় পরীক্ষা করে।

ডাক্তার তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন—হুঁ, আপনার তো কিছুই হয় নি।

রোগী একটু অবাক হয়ে বললে—কিছুই হয় নি ! তা'হলে এই উত্তেজনাটা কিসের ?

ডাক্তার তাকে বাধা দিয়ে বললেন—একটু অপেক্ষা করুন, ওটা এখুনি চলে যাবে। ব্যস্ত হবেন না, আপনার শরীর মন দুই-ই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখুনি !

—কিন্তু কি করে ? কোনো ওষুধ, কি ইনজেক্‌শন ঃ রোগী বলল।

—না না, ওষুধও নয়, ইনজেক্‌শনও নয়, আমার ফীসের অঙ্কটা বললেই হবে। ডাক্তার হেসে বললেন।

———

খেলা জয়ে প্রতিজ্ঞারও প্রয়োজন

মুকুল দত্ত

হকি খেলায় যে ভারত দীর্ঘ তিরিশ-বত্রিশ বছর ধরে ছিল বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা—যে ভারতের হকি দলের সঙ্গে পৃথিবীর কোন দেশের দল এঁটে উঠতে পারে নি, সেই ভারত পর পর দু'টি বিশ্বকাপ হকির খেলায় হেরে গেল।

বার্সিলোনায় আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপের খেলায় হেরেছিল সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কাছে। এবার আমষ্টার্ডামে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে হারল হল্যাণ্ডের কাছে।

আমষ্টার্ডামে বিশ্বকাপের খেলার সময় নিশ্চয়ই তোমরা রেডিওর সামনে কান পেতে বসে ভারতের খেলার ধারাবিবরণী শোনার জন্য। তোমরা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলে ফাইনাল খেলার ১০ মিনিটের মধ্যে ভারত ২—০ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের কাছে হেরে যাবে? শুধু দুই গোলে এগিয়ে থাকাই নয়, অতিরিক্ত সময়ের খেলায় একটি পেনাল্‌টি ষ্ট্রোকের সুবর্ণ সুযোগও পেয়েছিল ভারত। কিন্তু ওই সুযোগ থেকে গোল করতে পারল না সেণ্টার ফরোয়ার্ড গোবিন্দ। আর টাইব্রেকার পেনাল্‌টি ষ্ট্রোকেই ভারত হেরে গেল ৪—২ গোলে। অর্থাৎ টাইব্রেকারে পাঁচটি পেনাল্‌টি ষ্ট্রোক থেকে হল্যাণ্ড করল চারটি গোল, ভারত মাত্র দু'টি। নির্দিষ্ট ৭০ মিনিটের খেলা দু'টি গোল নিয়ে ফাইনালে

ভারতের হার হল ৪—৬ গোলে। বোধ হয় তোমাদের মনে আছে যে বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও ভারত প্রথম একটি গোল করে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়েছিল। তারপর ম্যুনিখ অলিম্পিক হকির সেমি-ফাইনালেও পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে। ম্যুনিখে আমাদের খেলোয়াড়রা গোল করার কুড়ি-বাইশটি সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারে নি। অপরদিকে পাকিস্তান পাঁচ-ছটি সুযোগের মধ্য থেকে দু'টি কাজে লাগিয়ে জিতে গেছে। ১৯৭০-এর ব্যাংকক্ এশিয়ান গেমসের হকি ফাইনালেও ভারত প্রায় একইভাবে পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়েছিল।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খেলায় আমাদের খেলোয়ড়রা প্রাধান্য বজায় রেখে আক্রমণ চালিয়ে, গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত হেরে যাচ্ছে। কেন বল ত?

তোমরা কেউ হয়তো ভাবছ, দুর্ভাগ্যের জন্যই আমাদের দল বার বার হেরে যাচ্ছে। কেউ ভাবছ, ভাল খেলতে পারছে না, গোল করতে পারছে না, তাই হারছে। খেলার ব্যাপারে আবার ভাগ্যের দোহাই কেন? যেখানে শক্তির পরীক্ষা, যোগ্যতার যাচাই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লা, নৈপুণ্যের বিচার, সেখানে আবার ভাগ্য কী?

কিন্তু ভাগ্যকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, খেলার ব্যাপারেও তেমন ভাগ্য আছে। বিশেষ করে যেখানে সমানে সমানে পাল্লা চলে। অসম প্রতিযোগিতায় অনেক সময় দেখা যায়, শক্তিশালী দল বার বার আক্রমণ করে একটি গোল করতে পারে না। আবার শক্তিহীন দল দু'তিনটি আক্রমণ থেকে একটি গোল করে খেলায় জিতে যায়। এখানেই থাকে ভাগ্যের প্রশ্ন।

তবু বিপরীত প্রশ্নও এসে পড়ে। ভারতের বেলায় বার বারই কি ভাগ্যদেবী মুখ ফিরিয়ে আছেন? আন্তর্জাতিক হকি খেলায় গত সাত বছরের ফল দেখে সেটাই মনে আসা স্বাভাবিক। আমি কিন্তু বলব, দুর্ভাগ্য অবশ্যই আছে। তার চেয়েও বেশী আছে দৈহিক অসামর্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাব। না হলে ফাইনাল খেলায় ১০ মিনিটের মধ্যে দু'টি গোল করে এগিয়ে গিয়েও সেই দল হেরে যায়।

দুই গোল বা তিন গোলে এগিয়ে গিয়েও পরাজয়ের নজীর আছে। এবং আছে বিশ্বকাপের খেলাতেই, তবে ফুটবলে। ১৯৬৬ সালে ইংলণ্ডে বিশ্ব-কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় উত্তর কোরিয়া ৩—০ গোলে এগিয়ে গিয়েও পর্তুগালের কাছে ৫—৩ গোলে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু পর্তুগাল ছিল অনেক শক্তিশালী দল উত্তর কোরিয়ার তুলনায়। হকি ফাইনালে ভারত ও হল্যাণ্ড, দু'টি দলই ছিল প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন। বরং খেলার প্রথা প্রকরণ, কব্জির পেলবতা, ষ্টিক চালনার নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণে পাল্লা কিছুটা ভারতেরই ভারী ছিল। তবু ভারত হারল কেন? না, দৈহিক ক্ষমতায় হল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমানে যুঝতে পারে নি, মনের দৃঢ়তা নিয়ে লড়তে পারেনি তার সঙ্গেই আছে ভাগ্যের বঞ্চনা।

খেলার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য, দক্ষতা, প্রথা প্রকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। তার সঙ্গেই প্রয়োজন মনের দৃঢ়তা ও শরীরের ক্ষমতা। 'জিতবই—কিছুতে হারব না' এই প্রতিজ্ঞায়ই হল্যাণ্ড বিশ্ব হকি কাপ জিতে গেল। ওই প্রতিজ্ঞায় তারা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে সেমিফাইনালে ১০৭ মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টাইব্রেকারে জিতেছে। ওই প্রতিজ্ঞায়ই ফাইনালে জিতেছে ভারতের বিরুদ্ধে একইভাবে ১০৭ মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টাইব্রেকারে।

প্যারী শহরের মজার ম্যাজিক

যাদুকর এ, সি, সরকার

যাদুসম্রাট, যাদুসম্রাট…

পথ চলতে চলতে থমকে থামি। মানুষ আর যানবাহনের মিছিল ভর্তি প্যারী শহরের সাঁস এলিজেঁ রাজপথ। বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে, বাংলা ভাষায় কে ডাকে আমাকে? পেছন ফিরে তাকাই। কালো ওভারকোট আর ধূসর রঙের ফেল্ট হ্যাটে সর্বাঙ্গ ঢাকা একজন দ্রুত হেঁটে আসছেন দেখতে পাই।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—"মাফ করবেন। বিখ্যাত যাদুসম্রাট এ, সি, সরকারকে চিনতে ভুল করি নি নিশ্চয়। কালকেই তো টেলিভিসনে আপনার ম্যাজিক দেখলাম। আপনি আমাদের দেশের গৌরব। আপনাকে ভুলে যেতে পারি কখনো।"

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্য ভদ্রলোক থামতেই আমি উত্তর করি—"আজ্ঞে হাঁ, আমিই আপনাদের সেবক এ, সি, সরকার।"

দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে জানাতে তিনি বলেন—"অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনাকে বিরক্ত করলাম। আমার নাম অমল ভট্টাচার্য, বর্ধমানের ছেলে। ঐ ওপাশের কাফেতে সরবর্ণের ছাত্র আমার কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আপনাকে দেখে ছুটে এলাম। আমার সঙ্গে ঐ কাফেতে আসার মত একটু সময় কি আপনার হাতে আছে? যদি দয়া করে আসেন তবে খুব ভাল হয়। আমার অনুরোধ কি রাখবেন?"

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা নির্ভেজাল। তাঁর সারল্য মুগ্ধ করে আমাকে। হাতে একটু সময় ছিল। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে পা বাড়াই কাফেটার দিকে।

কাফের ভেতরে ঢুকে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন একটা মাঝারী

আকারের কেবিনের ভেতরে। দেখি, সেখানে একটা বড় টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে আছে তাঁরই সমবয়সী নানা দেশী কয়েকজন মহিলা আর পুরুষ। কেবিনের ভেতরে ঢুকেই মহা উচ্ছাসে সরব হয়ে ওঠেন মিঃ ভট্টাচার্য—আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরে নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি গড় গড় করে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় বলে চলেন—

"পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত যাদুকর যাদুসম্রাট এ, সি, সরকার।"

পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গীরা সসম্ভ্রমে এক একজন উঠে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করে দিতে থাকলেন যার যার পরিচয়। তাঁদের অনুরোধে বসলাম ওদের টেবিলে, ধারের এক চেয়ারে। এলো খাবার। এলো গরম গরম কফি। জানি ম্যাজিক দেখানোর অনুরোধ আসতে আর দেরী নাই, তাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম এক ফাঁকে।

মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর বন্ধুদের হয়ে ম্যাজিক দেখানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করার উদ্যোগ করতেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—"আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। আমি নিজেই দেখাচ্ছি একটা ম্যাজিক।"

টেবিলের মধ্যিখানে পড়েছিল একটা গোলমরিচ গুঁড়োর পাত্র। সেটার দিকে নজর ফিরিয়ে বললাম—"কি বলেন, ওটা দিয়েই একটা ম্যাজিক দেখাই, কেমন?"

"আপনার যা দিয়ে ইচ্ছা তাই দিয়েই দেখান মঁস্যিয় সরকার।" মিষ্টি হেসে বললেন এক মহিলা।

—"তাহলে দ । করে মরিচ গুঁড়োর পাত্রটা ঠেলে দিন দেখি আমার এদিকে।"

হুকুম তামিল করতে দেরী হয় না তার।

"মের্সি বকু!-[অনেক ধন্যবাদ] বলে পাত্রটা সামনে টেনে নিই। বুড়ো আঙ্গুল বাদে ডান হাতের বাকী আঙ্গুলগুলো পাশাপাশি একত্র করে মেলে ধরে আমি সবচেয়ে বড় যে আঙ্গুল সেটা ঠেকাই মরিচ-পাত্রের মুখে। হাতের তেলোর দিকটা অবশ্যি থাকে আমার দিকে ফেরানো। আমার নির্দেশে দর্শকেরা আগে ভাগেই সবাই গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে টেবিলের ওপারে। মরিচ-পাত্রে আঙ্গুলের ডগা ঠেকিয়ে আমি শুরু করি ম্যাজিকের মন্ত্র পাঠপর্ব ঃ—

স্যেন নদীতে সেন মহাশয় ফেলেন জোড়া বড়শী,
তাই না শুনে কড়াতে তেল চাপান পাড়া পড়শী।
বড়শী কেটে মাছ পালালো, দেখতে হল ভীড় যা,
তার চাপেতে উঠলো কেঁপে নতরদামের গীর্জা.....

মন্ত্র পড়া শেষ করে আমি আস্তে আস্তে আমার ডান হাতটা তুলতে থাকি উপর দিকে। সবাই অবাক হয়ে দেখেন, আঙ্গুলের ডগার সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে মরিচের পাত্রটাও অদ্ভুতভাবে উপরে উঠে আসে। এই আজব মজা মুগ্ধ করে ওদের সবাইকে। "ত্রে রিয়া! ত্রে রিয়া!" [অতি উত্তম! অতি উত্তম!] বলে ওঁরা অভিনন্দিত করেন আমাকে।

আসর ভাঙ্গে। এগিয়ে দেবার ছলে আমার সঙ্গে পথে পা বাড়ান মিঃ ভট্টাচার্য। কিছুদূর এসে, পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে তিনি ফিসফিস করে বলেন—"যাদুসম্রাট, একটা অনুরোধ রাখবেন।"

কী অনুরোধ তিনি যে করবেন তাঁর চোখ মুখ দেখেই আন্দাজ করে নিয়ে বলি—"ম্যাজিকটা শেখাতে হবে, এই তো?"

—"এই না হলে যাদুসম্রাট! ঠিক ধরেছেন কিন্তু!" আমার প্রশংসায় সোচ্চার হন মিঃ ভট্টাচার্য।

—"এই দেখুন, আমার ডান হাতের তেলোর দিকে।" তাঁর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলি। তিনি সবিস্ময়ে দেখেন সেখানে আমার সবচেয়ে বড় আঙ্গুলটার ভেতরের পিঠে আংটির খাঁজে একটা দাঁত খোচানোর কাঠি এমনভাবে গোঁজা রয়েছে যে তার ছুঁচোলো দিককার সামান্য একটু অংশ আঙ্গুলটার ডগায় একটুখানি বেরিয়ে পড়েছে।

—"এই কি এ যাদুর রহস্য?"—ভট্টাচার্যের প্রশ্ন।

—"আপনারা আমার হাতের ওপীঠটাই শুধু দেখতে পেয়েছেন তাই বুঝতে পারেন নি যে মরিচের পাত্রের ফুটোর মধ্যে এই দাঁত খোচানোর কাঠির ছুঁচোলো ডগাটা গুঁজে দিয়ে আমি এই অসম্ভব ভেল্কী বাজীটা দেখালাম।"

—"এমনি কায়দা করলে আমিও এই ম্যাজিকটা দেখাতে পারবো? দ্বিধা জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য।

—"না পারার কোন কারণ নেই। একান্তে বসে বারে বারে অভ্যাস করে আগে এমনভাবে কৌশলটা রপ্ত করতে হবে যাতে কোন আড়ষ্টতা দর্শকদের না নজরে পড়ে। হাতের নড়ন-চড়ন স্বচ্ছন্দ না হলে কিন্তু সব মাটি!'

আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে কাফের দিকে পা বাড়ালেন মিঃ ভট্টাচার্য। আমি এগিয়ে চললাম আমার হোটেলের দিকে।

———

১। বল তো কোন্ রাজার নামটি
প্রিয় আমাদের সবাকার ?
মাথা তার কাটলে পরে
ওঠে শুধু হাহাকার !

২। কোন্ দেশে নাই তৃণ,
শস্য মোটে নাই,
তবু সবুজের দেখা—
নামের ভেতর পাই।

। এমন একটি ফসল আছে,
নাম বল তো তার।
মানুষের গায়ে ফলে,
নয় কি চমৎকার ?

৪। বলতে পারো দেশের নাম
এমন কোন দু'টির ?
একটির শির বেজায় জখম,
প্রবেশ পথ অন্যটির।

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর

ভাই রেবা,

তুমি এবারে খুব তাড়াতাড়ি আমার চিঠির জবাব দেবে আশা করি। সেদিন আমরা বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জাম গাছে উঠে মণ্টু খুব মজা পেয়েছিল। তাল গাছের মাথা অবধি একটি লতা জড়িয়ে উঠেছে দেখলাম, বাগানে থাকতে থাকতে হঠাৎ বৃষ্টি ধারা পড়ায় রাধা বাড়ী ফিরে গেল। আজ শুনলাম সে বিকারে ভুগছে। শুনে দুঃখিত হবে আমার রেকাবিটি ভেঙে গিয়েছে। ছুটিতে দাদা বাড়ী আসায় কাল মণ্টু মামার দোকানে গিয়ে মাংস কিনে এনেছিল। নীলিমা দাদার জন্য মালিনীর দোকান থেকে সুন্দর একটি মালা এনেছিল। দাদা আমাদের কাছে তিব্বতের লামাদের গল্প বলে খুব আনন্দ দিয়েছেন। সুচরিতা আজকাল বেশ এসরাজ বাজাতে পারে। কাল তা বাজাতে গিয়ে দেখে যে, কে তার বাক্স থেকে রঞ্জন নিয়ে গিয়েছে। কার এরূপ ছোট নজর হল বুঝা যাচ্ছে না। সুধীরার বর কাল দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হঠাৎ এই সময়ে একটা রব ওঠে যে খুকী পড়ে গিয়েছে। গদা সে সময় তাকে ধরে ফেলে, দেখে যে তার হাতে এ টি কাল দাগ পড়েছে। কয়েকদিন আগে আমরা রাজনগরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পথে একটি জরা-গ্রস্ত লোক দেখে মণ্টু তাকে একটি টাকা দান করেছিল। নদীর ধারেই একটি দরগা দেখতে পেলাম। তার পাশেই একটি গারদ, শুনলাম উন্মাদদের সেখানে রাখা হয়। ফিরবার পথে একটি আশ্রমও চোখে পড়ল। সেখানে ব্রতী বালকদের কর্তব্য পালনে তীব্র আগ্রহ দেখবার জিনিস। সম্প্রতি সাঁতারের প্রতিযোগিতায় আমাদের পাড়ার দীন দাদা নদী পার হয়ে একটি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে হারাধন রাহাও পার হয়েছিল। তাদের এরূপ সাহস দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তুমি সহসা একথা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

চিঠি লিখতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এখন পড়তে বসতে হবে। দেরী করলে দাদার কাছে মার খেতে হবে। ইতি, তোমার রমা।

———